মা মৌলীক্ষা

নান্‌কার মলুটী

গোপালদাস মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বোলপুর বুক হাউস

বোলপুর, বীরভূম।

*

শিক্ষা সংঘ

সিউড়ি, বীরভূম।

*

গ্রন্থায়ণ

ডাকবাংলোপাড়া

রামপুরহাট, বীরভূম।

*

মলুটীর মৌলীক্ষা মায়ের

মন্দির এবং মন্দিরের

সামনের স্টলগুলি।

*

প্রকাশক

মলুটী, ঝাড়খণ্ড।

নান্‌কার মলুটী

গোপালদাস মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ-
শ্রীসৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
মলুটী, জেলা - দুমকা,
ঝাড়খণ্ড, পিন - ৮১৬১০৩
মোবাইল - ৯৭৩২১৯৩৪০৪

মুদ্রণে ঃ-
শ্রীসুকেশ দাস
হর্ষ এন্টারপ্রাইজ
কাঠগড়া, বীরভূম
ফোন - ৯৪৭৪০২২৬৯২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ঃ-
শ্রীসুকেশ দাস

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৫ই আগষ্ট, ২০১০

মূল্য - পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রিয় জন্মভূমি মলুটী গ্রামের সকল অধিবাসীদের

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

নান্‌কার মলুটী অর্থাৎ মলুটীর নন্‌কর বা নিস্কর তালুক। ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন শাহের প্রদত্ত সনদে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কয়েক মাইল বিস্তৃত নান্‌কার রাজ্যের রাজধানী ছিল মলুটী।

মধ্যযুগে নবাব-বাদশা অথবা রাজা-মহারাজারা অনেককে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য নিস্কর জমিদারী দান করেছেন কিন্তু মজার কথা হল, নান্‌কার বললে কেবলমাত্র মলুটীর নিস্কর জমিদারীকেই বোঝায়। যদিও নান্‌কার তালুক মলুটীকে রাজধানী করার আগেও ছিল তথাপি নান্‌কার নামটি মলুটীকেন্দ্রিক জমিদারীর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। তার প্রধান কারণ নান্‌কারের রাজধানী হওয়ার পর মলুটী গ্রাম বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। নান্‌কারের রাজারা মলুটীতে সংখ্যাধিক ব্যয়বহুল মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং অন্যান্য রাজসিক ক্রিয়াকলাপও প্রচলিত করেন রাজধানীতে। এখন সেগুলি অনুধাবন করে বোঝা যায় যে, সেই সময় এই গ্রাম এই অঞ্চলের শীর্ষস্থানে ছিল। তখন এটি কেবল রাজশক্তির কেন্দ্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং তদানীন্তন কালে উন্নত সমাজ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একাংশের রূপকার হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেছিল।

মধ্যযুগে ও তার পরবর্তী সময়ে মলুটীর রাজাদের মত অনেক সামন্তরাজ এসেছেন, রাজত্ব করেছেন এবং চলে গেছেন কিন্তু কয়জনাই বা তাঁদের আসা যাওয়া মনে রেখেছে ? সেক্ষেত্রে কিন্তু মলুটীর রাজাদের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁরা নিজেদের জন্য রাজকীয় ঘর-বাড়ি না করিয়ে স্থায়ী দেবমন্দিরগুলি নির্মাণের দ্বারা মলুটী গ্রামকে এক উচ্চস্তরে স্থাপন করে গিয়েছেন। আজ দেশ-বিদেশের পর্যটকগণ কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি অবাক চোখে দেখে এগুলির নির্মাণকর্তা নান্‌কার মলুটীর রাজাদের সম্বন্ধে জানতে এবং তাঁদের কথা শুনতে খুবই আগ্রহান্বিত হতে দেখা যায়।

দেবালয় ছড়িয়ে আছে সারা গ্রামে। একটি গ্রামে এতগুলি দেবালয় বিশেষ করে শিবমন্দিরের অবস্থিতি তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র গ্রাম মলুটীর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফলের মধ্যে যত শিবালয় দেখা যায়, ক্ষেত্রফলের অনুপাতে শিবমন্দিরের এই ঘনত্ব, শিবপুরী কাশীতেও সম্ভবতঃ দেখা যাবে না। সেইজন্য অনেকে এই গ্রামকে গুপ্তকাশী মলুটী বলে

থাকেন। অন্যদিকে কাশীর সঙ্গেও মলুটীর রাজপরিবারের একটা শক্ত যোগসূত্র রয়েছে। কাশীর সুমেরু মঠের দণ্ডিস্বামীগণ শিষ্য পরম্পরায় মলুটীর রাজাদের কুলগুরু।

এই গ্রাম একসময় শিক্ষা-দীক্ষায়, রাজনৈতিক চেতনায় এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল কিন্তু পরবর্তী কালে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চাকুরিজীবি হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন গ্রামের বাইরে থাকতে বাধ্য হন। গ্রামে শিক্ষিত লোকের অনুপস্থিতি, যোগাযোগের অভাব এবং সার্বিকভাবে আর্থিক অবনতির জন্য গ্রামটি গত শতাব্দীর চার দশকের পর হতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

মলুটীর রাজারা তাঁদের সূর্য্যালোকিত দিনে একাধিক মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন কিন্তু সময় ও রাজপরিবারের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মন্দিরগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এর ফলে মধ্যযুগের এই অমূল্য ক্ষয়িষ্ণু শিল্পকলাগুলিকে জাতীয় ক্ষতি বলে মেনে নিয়ে সরকারের তরফ হতে সেগুলির সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় অবহেলার আঁধার কেটে শীঘ্রই আবার মলুটী গ্রামের সূর্য্যালোকিত দিন ফিরে আসবে।

মলুটী দেবভূমি। মহাযোগী বামাক্ষেপা সহ বহু সাধক-ভক্তের পদধূলি পড়েছে এই গ্রামে। বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির আগমন হয়েছে এই দেবভূমিতে। এখানে পৌছানোর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে সাধক, ভক্ত বা জ্ঞানমার্গের ব্যক্তিগণের আগমনে এই গ্রামের বাতাস, জল এবং ধূলিকণা বড়ই পবিত্র হয়ে আছে।

অনেকদিন হতেই মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল যে, জন্মভূমি মলুটীর উপর সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক একখানি পুস্তক রচনা করার, যাকে আধার করে ভবিষ্যকালের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা আমার গ্রাম সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ্যে আনবেন। এই সংকল্প সামনে রেখেই লেখা হল 'নান্‌কার মলুটী'। পুস্তকখানির আলোচ্য মূল বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে - এই গ্রামের পরিচয়, নান্‌কারের রাজাদের ইতিহাস, এখানকার মন্দির ভাস্কর্য, গ্রামের দেব-দেবী ও প্রচলিত লোকসংস্কৃতি এবং গ্রামে আগত কিছু সাধক-ভক্তের কথা। গত তিন দশকের বেশী সময় ধরে মলুটী গ্রামের এবং নান্‌কার রাজ্যের রাজাদের ঐতিহাসিক পটভূমির খোঁজ করে

নানকার মলুটী

যখন যেমন পেয়েছিলাম বিভিন্ন সময়ে 'দেবভূমি মলুটী', 'বাজের বদলে রাজ' এবং Temples of Maluti নামক পুস্তকগুলিতে উল্লেখ করেছি। ঐ পুস্তকগুলিতে উল্লেখিত তথ্যগুলির মধ্যে থাকা দু-একটি ভুল-ত্রুটির সংশোধন সহ কিছু নূতন তথ্য সংযোজন করে 'নানকার মলুটী' পুস্তকখানি লেখার চেষ্টা করা হল। একই সঙ্গে পুস্তকটির মূল্য যাতে খুব বেশী না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এটির কলেবরও সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

'নানকার মলুটী' বইখানি লিখতে একাধিক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেইসব পুস্তকগুলির সূচী বই এর শেষে দেওয়া হল। এছাড়া মলুটীর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মলুটীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা, সেখানকার বয়স্থ লোকেদের কাছে জানতে চেষ্টা করেছি। মলুটী গ্রামের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এমন বহিরাগত বা গ্রামের লোকের কাছে প্রাপ্ত সংগ্রহ থেকে কিছুটা এই বইয়ে রেখে দিয়েছি। এই সব তথ্য দিয়ে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

মলুটী নিয়ে লেখালেখির জন্য গত তিন দশক ধরে উৎসাহ দিয়ে আসছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করেছেন নানকার রাজবংশের উত্তরসূরীদের অন্যতম শ্রীসতীনাথ রায় এবং শ্রীশচীদুলাল রায় মহাশয়গণ। বন্ধুবর শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় 'নানকার মলুটী' পুস্তকখানি লেখার জন্য বহু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে বইটিকে তথ্যভিত্তিক করা সম্ভব হত না। মন্দিরের ছবিগুলি তুলে দিয়েছেন মল্লারপুর রাজ স্টুডিওর সত্বাধিকারী শ্রীযোগেশচন্দ্র মণ্ডল ও জাপানী পর্যটক শ্রীতাকাকাজু মাৎসুমোতো। শ্রীসৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় বইখানি প্রকাশনার ভার নিয়েছেন এবং হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাষ্ঠগড়া, বীরভূম এর পক্ষ থেকে শ্রীসুকেশ দাস বইটি ছেপে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী এবং সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ঝাড়খণ্ড রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মন্দিরের চিত্রগুলি প্রকাশিত।

মলুটী (ঝাড়খণ্ড) — গোপালদাস মুখোপাধ্যায়
১০ই বৈশাখ, ১৪১৭ (২৪শে এপ্রিল ২০১০)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মলুটী গ্রামের পরিচয়

ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বসীমান্তে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের আঁকা-বাঁকা সীমারেখা ছুঁয়ে অবস্থিত মলুটী গ্রাম। এই গ্রামের পরেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা। রামপুরহাট হতে রামপুরহাট-দুমকা বাসপথে বারো কিলোমিটার গিয়ে 'সুঁড়িচুয়া' বাসস্টপ। আর সেখান হতে দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই পাওয়া যাবে ঐতিহাসিক তথা মধ্যযুগীয় পুরাকীর্তি সম্বলিত নান্‌কার রাজ্যের একদা ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজধানী মন্দিরের গ্রাম মলুটী। পৃথিবীর মানচিত্রে গ্রামটির অবস্থান নির্দিষ্ট ভাবে দেখতে গেলে ২৪°৭′ অক্ষরেখা এবং ৮৭°৪০′ দ্রাঘিমা রেখার মিলিত অতি ক্ষুদ্র বিন্দুটিই হবে মলুটী গ্রাম।

বর্তমানে গ্রামটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা বিভাগের অন্তর্গত দুমকা জেলায় অবস্থিত। রামপুরহাট রেল স্টেশন হতে দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার এবং জেলাসদর দুমকা হতে দূরত্ব হচ্ছে ৫৫ কিলোমিটার। ২৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে থানা, নাম শিকারীপাড়া। সমগ্র অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় দিকই সাঁওতাল-আদিবাসী অধ্যুষিত।

গ্রামের নাম মলুটী। নামটির কোন স্থান, কাল অথবা বুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় না। সেইজন্য অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, গ্রামের প্রচলিত নামটি কোনও একটি আদি নামের অপভ্রংশ। সেই আদি নামটি চিহ্নিত করা হয়েছে 'মহুলটী' বলে এবং বর্তমান মলুটী নামটি ঐ আদি নামের রূপান্তর মাত্র। সাঁওতাল পরগনা বিভাগের এই মালভূমি অঞ্চলে মহুল গাছের প্রাচুর্য্যের জন্য 'মহুল' নামযুক্ত যেমন 'মহুলপাহাড়ী', 'মহুলবোনা' ইত্যাদি অনেক গ্রামের নাম পাওয়া যায়, ঐরকম ভাবে এই গ্রামের নামও সেই সময় মহুল যুক্ত হয়ে থাকবে। এই অনুমানের প্রমাণস্বরূপ জমি ও আর্থিক লেন-দেনের কয়েকটি পুরোনো দলিলের উল্লেখ করা যেতে পারে। দলিলগুলি লেখা হয়েছিল বাংলা সন ১২৭২ হতে ১২৮৮ সালের মধ্যে (ইংরাজী ১৮৬৫ হতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে)। গ্রামের নাম

লেখা হয়েছে 'মহুলটী'। [১] আবার ১৩০২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি হ্যাণ্ডনোটে গ্রামের নাম মলুটী লেখা আছে। অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে থাকা বীরভূম জেলার কালেক্টর ১৭৯৩ ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের দুখানি চিঠিতে নান্‌কার মুলোটী বলে উল্লেখ করেছেন। [২] এর থেকে ধারণা করা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা লেখায় মলুটীর নাম মহুলটী বলে লেখা হত। এটাও সম্ভব ইংরেজী উচ্চারণের মাধ্যমে মহুলটী নাম মলুটীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হতেই মলুটীর জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে গ্রামের নাম মলুটী বলেই লিখিত আছে।

অধুনা মলুটী গ্রাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত দুমকা জেলার মধ্যে থাকলেও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গ্রামটি ছিল তদানীন্তন বীরভূম জেলার থানা দরি মৌড়েশ্বরের অধীনে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিদো-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিণাম স্বরূপ Act No. XXXVII of 1855 দ্বারা নূতন জেলা সাঁওতাল পরগনার সৃষ্টি হয়। সেই সময় বীরভূমের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত মৌড়েশ্বর থানার অধীনস্থ মলুটী গ্রামটিকে নূতন জেলা সাঁওতাল পরগনার ভিতরে নিয়ে নেওয়া হয়। Act No. XXXVII of 1855 দ্বারা বীরভূমের যে সমস্ত অংশ সাঁওতাল পরগনা জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল - "পরগনা পাবিয়া, তাপ্পা সারথ-দেওঘর, তাপ্পা কুণ্ডহিত-করাইয়া, তাপ্পা মহম্মদাবাদ এবং পরগনা দরি মৌড়েশ্বরের চিলা বা চন্দনঘাট নালার উত্তরে অবস্থিত সম্পূর্ণ অংশ"। [৩] মলুটী গ্রাম চিলা বা চন্দনঘাট নালা নদীর উত্তরদিকে থাকার জন্য এটিকে নূতন জেলা সাঁওতাল পরগনার মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়।

একশো পঞ্চাশ বছর আগে এখানকার জমিদারী সংক্রান্ত কাজগুলি নিয়ন্ত্রিত হত বীরভূম কালেক্টারী হতে। তখন সদর কাছারি ছিল সিউড়ি আর ছোট কাছারি ছিল রামপুরহাটের চার কিলোমিটার পশ্চিমে খরবোনা

(১) Exibit 1 - শ্রীমহেশচন্দ্র চৌধুরি পাণ্ডা এবং শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত দুইখানি দলিলের আংশিক প্রতিলিপি।

(২) WB District Records Birbhum 1786-1797 & 1855, Page 53 & 66

(৩) The Santal Pargana Manual 1911, Page 8

গ্রামে। এই গ্রামের, পরগনা দরি মৌড়েশ্বর লেখা কৃষিজমির পুরোনো পর্চাগুলি এখনও ব্যবহারে আছে। [৪] আরও আগে এটি পরিচিত ছিল বীরভূমের পশ্চিম সীমানার অরণ্য অঞ্চল বলে। প্রাচীন বীরভূম বর্ণনায় বীরভূমের পশ্চিমপ্রান্তে গভীর অরণ্যানীর উল্লেখ পাওয়া যায় —

> "বীরভূঃ কামকোটি স্যাৎ প্রাচ্যা জলান্বিতা
> আরণ্যকং প্রতিচ্যাঞ্চ দেশোদার্যদ উত্তরে।" [৫]

অর্থাৎ বীরভূমের পূর্বে গঙ্গা, পশ্চিমে অরণ্য এবং উত্তরে মালভূমি। আর বাস্তবিক ভাবে বন কেটে বসত স্থাপন করা হয়েছে মলুটীতে। গ্রামের ভিতরে একটা উচু অংশকে এখনও লোকে বলে পাহাড়ী এবং গ্রামের চতুর্দিকে বিস্তৃত কৃষিযোগ্য জমিগুলির নাম হচ্ছে — বনকাটা, শিয়ালমারা, বাঘবিয়ে, হরিণধান্দা, হাতিবাঁধা বা মোষখেলা। এই সমস্ত নামগুলির ব্যবহার হতে বোঝা যায় যে গভীর অরণ্য পরিষ্কার করেই এই গ্রামের পত্তন হয়েছিল। "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কালেক্টারের রিপোর্টে দেখা যায় এই অঞ্চলে বাঘ, ভাল্লুক ছাড়া বন্যহস্তিরও উপদ্রব ছিল খুব বেশী।" [৬] ঐ সব বুনোহাতি এবং অন্যান্য বন্যজন্তু যাতে রাজধানী মলুটীতে প্রবেশ করতে না পারে, সেইজন্য মলুটীর রাজারা একটি বৃহৎ বরকন্দাজ দল নিযুক্ত করেছিলেন। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে প্রবাহিতা চিলা কাঁদরের উত্তরদিকের কিনারায় পাথরের বড় বড় চাঁই দিয়ে একটি 'ওয়াচ পয়েন্ট' তৈরী করিয়েছিলেন ঐ উদ্দেশ্যে। চৌকিটি এখন ভেঙে চুড়ে গেলেও উপর্যুপরি দু একটি বিশাল পাথরের অবস্থান এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ পাথরগুলি দেখে ওটির পূর্বস্থিতি সহজেই অনুমান করা যায়। জনশ্রুতি আছে দুশো-আড়াইশো বছর আগে মলুটী সন্নিহিত হস্তিকাঁধা গ্রামটি ছিল গভীর জঙ্গলে এবং সেখানে বন্যহস্তিরা দিন-দুপুরে

(৪) Exibit 2 - দরি মৌড়েশ্বর লেখা পুরাতন পর্চার প্রতিলিপি।

(৫) মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা।

(৬) Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32, Page 2

দল বেঁধে নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়াত। এই জনশ্রুতির সত্যতা কিছুটা যাচাই হয় হান্টার সাহেবের লেখা হতে — "বন্যহস্তির উপদ্রবে দেশবাসীগণ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই জেলায় (বীরভূমে) প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভেই তাহাদের পক্ষে বর্বর বন্যহস্তি বিতারিত করা প্রধান ও প্রথম কর্তব্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জন্ম-মৃত্যুর পুস্তকে দুই বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে ছাপান্নটি গ্রাম বন্যহস্তির উৎপাতে একবারে উচ্ছন্ন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।" [৭] অন্য একটি পুস্তকে দেখা যায় যে, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলার শতশত গ্রাম যখন জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তখন ছোটনাগপুরের বুনোহাতি দলে দলে বীরভূম, মল্লভূমের মধ্যে উন্মত্তের মত চলে বেড়াত, বাঘের তো কথায় নেই।" [৮]

কোনও এক সময় মলুটী গ্রামসহ এই অঞ্চল বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের আধিপত্যে এসেছিল। মল্লরাজ শাসিত ভূভাগের নাম ছিল মল্লভূম। এক সময় এর বিস্তৃতি ছিল - "উত্তরে সাঁওতাল পরগনার আদিভূমি দামিন-ই-কো, অর্থাৎ বর্তমান পাকুড় মহকুমা, পূর্বে বর্দ্ধমান, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির কিছু অংশ। এই বিশাল ভূভাগের নাম ছিল মল্লভূম।" [৯] বাঁকুড়ার প্রথম মল্লরাজা আদিমল্ল (৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) হতে ৪৯তম নৃপতি বীর হাম্বিরের (১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে এই বিশাল মল্লভূমের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। "কিভাবে বাঁকুড়া - বিষ্ণুপুরের রাজাগণ বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূমের পার্বত্য অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে বর্তমানে এবিষয়ে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।" [১০] তবে মলুটী গ্রামটি যে কখনও মল্লভূমের প্রভাবাধীন ছিল তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় এ গ্রামের মন্দির ভাস্কর্য্যে মল্ল-সংস্কৃতির প্রভাব দেখে। মলুটী গ্রামে শিবমন্দিরের সংখ্যাবাহুল্য এবং এদের উপর কারুকার্য্যগুলি

---

(৭) *W. W. Hunter - Annals of Rural Bengal, Page 65-66*

(৮) *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 44 - 1875*

(৯) *অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ ১৪*

(১০) *Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32, Page 41*

মল্লরাজাদের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে। মলুটীর মন্দির ভাস্কর্য্যে বাঁকুড়ার মন্দির নির্মাণশৈলী যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে, সেটা মলুটীর বর্তমান পুরাকীর্তি নিদর্শনের মধ্যেই প্রকটিত।

এই অঞ্চলটি মল্লভূম ভূখণ্ডের অধীনে আসার আগে সম্ভবতঃ সুহ্মদেশ নামে পরিচিত ছিল। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্ত' হতে মহাভারত, দশকুমার চরিত, রঘুবংশম্ ইত্যাদি গ্রন্থে সুহ্মদেশ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে একটি সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে [১১] সুহ্মদেশের অবস্থান জানতে পারা যায়। যথা —

> "গৌড়স্য পশ্চিমভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ
> দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ গৌড়ের পশ্চিমে, বীরদেশের পূর্বে এবং দামোদর নদের উত্তরভাগে সুহ্মদেশ অবস্থিত। বীরদেশ সম্ভবতঃ ঝাড়খণ্ডকে বোঝায়। কেননা "বীর মুণ্ডারী শব্দ — অর্থ হল জঙ্গল"। [১২] এই প্রসঙ্গে "বীরভূম নামও বীররাজার ভূমি বা বীরদের ভূমি অর্থে উদ্ভূত নয়।" [১৩] "বর্তমান সাঁওতাল পরগনা জেলাও বীরভূমের উত্তর পশ্চিমাংশের জঙ্গলময় অঞ্চল হওয়ার জন্য নামাঙ্কিত হয়েছিল বীরভূমি অর্থাৎ জঙ্গলভূমি বলে।" [১৪] দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থ অনুসারে দামোদর নদের উত্তরে এবং জঙ্গলভূমি ঝাড়খণ্ডের পূর্বে যে সুহ্মদেশ, সেটি মোটামুটি দুইশত বৎসর পূর্বের বৃহৎ বীরভূম জেলার এই অংশকেই বোঝায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মলুটী রাজপরিবারের 'রায়' উপাধিধারী বংশধরগণকে বহুকাল হতে 'সুমু' বলা হয়ে আসছে। এই অপ্রচলিত শব্দটি মলুটী ছাড়া অন্য কোথাও শোনা যায় না। রায় পরিবারের লোকেরাই এখানকার আদি বাসিন্দা। সুহ্ম শব্দের

---

(১১) *দিগ্বিজয় প্রকাশ*

(১২) *বিনয় ঘোষ - পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৯*

(১৩) **Report on the Census of the District of Birbhum - 1891, Page 2**

(১৪) *W.W. Hunter - Annals of Rural Bengal, Appendix D*

অপভ্রংশে 'সুমু' হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, ব্রাহ্মণ শব্দ রূপান্তরিত হয়ে 'বামুনে' দাঁড়িয়েছে। 'সুমু' শব্দের দ্বারা রায় পরিবারবর্গের লোকদিকে প্রাচীন সুহ্মদেশের [১৫] অধিবাসী বলে ঠাট্টা-ইঙ্গিত সুবাদে ঐটির আমদানি হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

তদানীন্তন মল্লভূম ও পরবর্তী কালে যথাক্রমে বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা এবং শেষে দুমকা জেলার অন্তর্গত মলুটী নানকার (নিষ্কর) রাজ্যের স্থাপনা পাঁচশো বছর আগে হলেও মলুটী গ্রামের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল তার অনেক পরে। রাজাদের বংশতালিকা এবং গ্রামে রাজাদের দ্বারা স্থাপিত মন্দিরগুলির লিপি হতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই গ্রামে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেন আনুমানিক ১৬১৭ শকাব্দে (১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) অর্থাৎ এখন হতে সোওয়া তিনশো বছর আগে। এর পূর্বে রাজপরিবারের প্রাথমিক রাজাগণ বীরভূম জেলার ডামরা গ্রামে রাজধানী স্থাপন করে সেখানে প্রায় দেড়শো বছরের কিছু বেশী সময় বাস করেছিলেন।

মলুটী গ্রামের অবস্থান একটি উঁচু টিলার উপর। গ্রামের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বদিক বেড় করে বয়ে যাচ্ছে চুমড়ে এবং চন্দননালা নামে দুটি ক্ষুদ্র নদী। ঐ নদী দুটি আবার মাল্‌তারা বলে একটি জায়গায় একত্র হয়ে 'চিলে' নামে দ্বারকা নদীতে পড়েছে তারাপীঠের কাছে। পশ্চিমদিকে ঢেউ খেলানো মালভূমি আর দূরে দেখা যায় ছোট ছোট পাহাড়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব। পথ চলতি ব্যস্ত পথিককেও থেমে যেতে হয় প্রকৃতির এই রূপ দেখার জন্য। বর্ষায় দেখা যায় গ্রামের চারিদিকে সবুজের ঢেউ আর তিনদিকে ঘেরা অর্দ্ধগোলাকৃতি নদীর সফেন জল। বৈশাখে রং পাল্টায়। সে রূপ বৈরাগীর রূপ। সাঁওতাল পরগনার রুক্ষ গৈরিক প্রান্তর, সর্বত্যাগী, গৈরিক পরিচ্ছদে আবৃত সন্ন্যাসীর ন্যায় উদাসীন। সাঁওতাল বালক দুপুর রোদে শাল-মহুল গাছের নীচে ক্লান্ত সুরে বাঁশী বাজায়। তার বিলম্বিত ঢেউ খেলানো সুর ধাক্কা দিয়ে যায় উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাসকে। সেই সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে প্রতিধ্বনিত হয় দূর গ্রামের কুটির

(১৫) মহাভারতের আদিপর্বে ১০৪ অধ্যায়ে সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে এইভাবে—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সুহ্মশ্চতে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"

হতে কুটিরে। সন্ধ্যার পর পাশের সাঁওতাল গ্রামগুলি হতে ভেসে আসে মাদলের শব্দ। শক্ত, কর্মঠ সাঁওতাল পুরুষ এবং রমণীদের সারাদিন কর্মের সঙ্গে সংগ্রামের পর মাদলের বাদ্য যেন, দিনের কর্ম-বিরতির ঘোষণা জানায়।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের শেষপ্রান্তে অবস্থিত মলুটী গ্রামকে একটি ক্ষুদ্র নদীর রেখা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হতে আলাদা করে দিলেও গ্রামের পরিবেশ পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রামের মতই শান্ত এবং স্নিগ্ধ । গ্রামের অধিবাসীগণ বাংলা ভাষা-ভাষী। পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় এবং সাধারণ আচার ব্যবহার এই গ্রামের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। তবে গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক নিকটস্থ শহরে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে কর্মোপলক্ষ্যে বাস করার জন্য মলুটীর ভাবধারা মিশ্র প্রকৃতির ও সমস্ত রকমের প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে। এই মিশ্র ভাবধারা খাঁটি ভারতীয় কৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। চলমান উন্নত ভাবধারার জন্য মলুটী অন্যান্য সাধারণ গ্রামগুলি হতে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। গ্রামে বসতবাড়ীর সংখ্যা প্রায় তিনশো এবং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পৌনে একশো মন্দির। বাড়ীগুলি একটির গায়ে অন্যটি লেগে রয়েছে। এক-এক জায়গায় বাড়ীর সঙ্গে মন্দিরও লেগে আছে। ফলে মধ্যম আকৃতির গ্রামটির অল্প পরিসরের মধ্যে বসতি কিছুটা ঘন। জনসংখ্যা তিন হাজারের মত, কিন্তু এই জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন না। [১৬] স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ তফসিলি এবং বাকি বর্ণহিন্দু ও কিছু অন্য পিছড়ি জাতি আছে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরই সংখ্যাধিক্য। ব্রাহ্মণ ছাড়া গ্রামে গোয়ালা, তেলী, নাপিত, ময়রা, তন্তুবায়, বাগ্দি, কামার, সুঁড়ি, সাঁওতাল ও তফসিলি জাতির বাস রয়েছে। 'রায়' উপাধিধারী মলুটীর রাজার বংশধরগণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁরা মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলা হতে বেশ কিছুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণ এনে মেয়েদের বিয়ে দেন। সঙ্গে বাস্তু ও কৃষিযোগ্য জমি দান করে এখানেই তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা

(১৬) ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় এই গ্রামে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল দেড় হাজার।

করেন। নিয়মটি সে সময় জমিদার বংশে 'কন্যা পালন' ব্যবস্থা বলে পরিচিত ছিল। এই ব্যবস্থার কারণগুলি সম্ভবতঃ রায় পরিবারবর্গ নিজেদের লোকবল বাড়াবার জন্য কন্যা-জামাতার ন্যায় নিকট আত্মীয়দের কাছাকাছি রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা ছিল, জমিদারগণ তাঁদের পরিবারের কৌলিন্য প্রকাশের জন্য কুলীন জামাতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতেন। কুলীন জামাতারাও কন্যাপণ হিসাবে ঘর-বাড়ী ও জমি-জায়গা তো পেতেনই, তদুপরি কেউ কেউ জমিদারীর অংশও পেয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "মহারাজ বল্লাল সেন সমাজে শুদ্ধিকরণের অভিপ্রায়ে অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের উন্নতি করিবার প্রয়াস পাইলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ সনাতন ধর্ম এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সমাদর বৃদ্ধির অভিপ্রায়েই নূতন করিয়া কৌলিন্য প্রথার সংস্কার করিয়াছিলেন।" [১৭] ঐ সময় হতেই গত শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কুলীন-ব্রাহ্মণ পাত্রের চাহিদা খুবই বেড়ে যায়।

গোয়ালা, ময়রা ইত্যাদি নবশাখের অন্তর্গত গৃহস্থরা জীবিকা উপার্জনের খোঁজে নূতন রাজধানী মলুটীতে আসেন এবং রাজারা তাঁদিকে সাদরে গ্রহণ ক'রে মলুটীতে বাসের অনুমতি দেন। তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউড়ি, ডোম ও কাহার শ্রেণীর লোকেরাই প্রধান। এই সমস্ত পরিবার রাজবাড়ির কর্মের জন্য পশ্চিমবাংলা হতে আগত। পাল্কি বইবার জন্য কাহার এবং পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল অন্যান্য তফসিলি ব্যক্তিদের। মলুটীর রাজারা এই সমস্ত কর্মচারীদিকে নিয়মিত বেতন দেওয়ার পরিবর্তে বাস্তু ও কৃষিযোগ্য জমি দিয়েছিলেন। এরকম বন্দোবস্ত করা জমিকে বলা হত 'চাক্‌রান জমি'। যত দিন কাজ করবে তত দিন জমি ভোগ করবে, কাজ ছেড়ে দিলে রাজা জমি ফেরৎ নিয়ে নেবেন। ফলে বংশ পরম্পরায় পৈত্রিক কর্ম নিয়ে তাদের থাকতে হত।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ছাড়াছাড়া ভাবে অনেকগুলি ঝামার ঢিপি দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ ঝামা-ঢিপি এই গ্রাম সংলগ্ন মাসড়া গ্রাম হতে গণপুর, ডেউচা এবং মহম্মদবাজার পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার

(১৭) *কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় - মধ্যযুগে বাংলা, পৃঃ ৩৯৯*

জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। ঝামা-ঢিপির স্থানগুলি তদানীন্তন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লৌহ-নিষ্কাসন কেন্দ্র ছিল। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলটিকে লোহামহল বলা হত। আলোচ্য লোহামহল সম্বন্ধে গৌরীহর মিত্রর 'বীরভূমের ইতিহাস' এবং হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal গ্রন্থদ্বয়ে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বীরভূমে ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিক যাঁরা ব্যবসায়ের জন্য এসেছিলেন, মিস্টার ফারকুহর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। "মিস্টার ফারকুহর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ৭৬৫ টাকায় তদানীন্তন লোহামহলের ইজারা নেন। ইংরাজী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর আমলে ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বার্ষিক ৫০০ টাকায় ইজারা লইয়া চালাইতে পারেন নাই। Summer Heatly and Co. পঞ্চকোট এবং বীরভূমে স্থানে স্থানে লৌহ প্রস্তুত করার স্বত্ব উপভোগ করিতে থাকিলে Motte & Farquhar Co. ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে কোম্পানীর জমিদারী সন্দেহে লৌহ প্রস্তুত করিয়া বিনা শুল্কে বিক্রয় করিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়া সরকারকে আবেদন করেন এবং পরে বীরভূমে উৎকৃষ্ট প্রস্তর প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে লৌহ নিষ্কাসন ব্যবসায়ের অনুমতি পান। বীরভূমে তাঁহার এই ব্যবসায়ের বিক্ষিপ্ত স্থানসমূহ সমবেতভাবে লোহামহল নামে পরিচিত। লোহা এখান হতে ৫ টাকা মন দরে বিক্রয় হইত অথচ ইংলণ্ড হইতে আমদানিকৃত লোহার দর ১০/১১ টাকা মন ছিল।" [১৮] ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফারকুহর কোম্পানীর হাতে লোহামহলের ইজারা ছিল। পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন লোককে স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। মলুটী এবং অন্যান্য গ্রামগুলি হতে নিষ্কাসিত লোহা বিক্রীর জন্য মলুটীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাসড়ায় আনা হত। মাসড়া গ্রামের মধ্যপাড়াকে বয়স্ক লোকেরা এখনও ল'বাজার (লোহাবাজার) বলে থাকেন। এই ঝামা ঢিপির প্রসঙ্গে একটি সরকারী রিপোর্টের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সরকারী রিপোর্টটি ছিল — "১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেলিয়া নারায়ণপুর গ্রাম লৌহ নিষ্কাসনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। ডেউচা, ডামরা এবং গণপুরে যথাক্রমে তিরিশ, চার এবং ছয়টি

(১৮) *গৌরীহর মিত্র - বীরভূমের ইতিহাস (২য় ভাগ), পৃঃ ১৯-২০*

লোহা গলানো চুল্লীতে কাজ হচ্ছিল। আশপাশের গ্রামগুলিতে কেবলমাত্র স্তূপাকার ঝামার ঢিপি দেখা যায় এবং লৌহপ্রস্তর ফুরিয়ে যাওয়ায় কোন চুল্লী দেখা যায় নাই।" [১৯]

মলুটী গ্রামের চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বিশেষ করে দক্ষিণ দিকের চিলা নদী এবং নদীর উভয় পার্শ্বে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ-প্রেমীদের আনন্দিত করবে। চিলা নদীর আরও উজানে, পশ্চিমদিকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে 'শিরালী' নামে একটা স্থানে প্রাকৃতিক নিয়মে পাথরের এক বাঁধ তৈরী হয়েছে। ফলে, সেখানে নদীগর্ভেই একটি ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। জলাশয়টিতে সারা বছরই জল থাকে। এখানে গ্রামের লোকেরা পৌষ মাসে ছোট ছোট দলে এসে পৌষালী বা চড়ুইভাতি করে থাকেন। 'শিরালী' সাঁওতালী শব্দ, বাংলা অর্থে দেশীয় বালি হাঁস বোঝায়। সারা বছর জল জমে থাকার জন্য অতীতের দিনগুলিতে সম্ভবতঃ ঐসব বালি বা বেলে হাঁস এখানে চড়ত। সেই থেকে নামটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়।

বর্তমান সময়ে এই গ্রামে একটি জুনিয়ার হাই স্কুল এবং একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে। দুটি বিদ্যালয়ই শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষায়তন দুটির প্রাচীনত্ব দেখে বোঝা যায় যে, বহু বছর আগে হতেই এখানে শিক্ষার আলো জ্বলছে। এছাড়া গ্রামে আছে একটি পুরাতন ডাকঘর এবং ইদানিং কালে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাঙ্ক।

গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলতঃ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। ঐ সঙ্গে ছোট-খাটো ব্যবসা এবং সময় বিশেষে অস্থায়ী কিছু অর্থকরী কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রামবাসীগণ আর্থিক দিক হতে সম্পন্ন না হলেও শান্তিতে দিনাতিপাত করে। তবে, ঝাড়খণ্ড সরকার মলুটী গ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে গ্রামটিকে পর্যটনের উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরিকাঠামোর উন্নতির চেষ্টাও চলছে। আশা করা যায় আগামী দিনে গ্রামটির, সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় পুরোপুরি পর্যটনক্ষেত্ররূপে পর্যবসিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

(১৯) ***Extract from A report of the Geological Survey 1851 - 52***

নান্‌কার রাজ্যের ঐতিহাসিক পটভূমি
(১) বাজের বদলে রাজ

বাজপাখীর বদলে রাজ্য পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। তবে এই রকম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পাঁচশো বছর আগে ঘটেছিল আর তারই ফলে রাজা বাজবসন্ত স্থাপন করেছিলেন নান্‌কার রাজ্যের। রাজা বাজবসন্ত কোনও রাজপুত্র ছিলেন না, তিনি বাল্যকালে একজন সামান্য রাখাল বালক ছিলেন। প্রাচীন বীরভূম জেলায় মৌড়েশ্বর গ্রামের নিকটবর্তী কাটিগ্রাম ছিল একটি ছোট লোকালয়। এই কাটিগ্রামেই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বসন্তর জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ার জন্য বসন্তকে সেই বালক বয়সেই অপরের গোচারণ করে সংসারে সাহায্য করতে হত। রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে বসন্ত ঐ গ্রামের এক রামমোহন ভট্টাচার্য্যের গৃহে গো-রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য রাখাল বালকের ন্যায় একদিন বালক বসন্ত, মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে দুপুর রৌদ্রের সময় এক গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্য্য ঢলে পড়ার সঙ্গে গাছের ছায়া সরে গেলে, বসন্তর মুখে রৌদ্র এসে পড়ল। এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। অজাত স্থান হতে এক বিষধর সর্প এসে বসন্তর মুখের উপর হতে সূর্যকিরণ আড়াল করার জন্য ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এই দৃশ্য যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহল এনে দিল মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক বস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসীর মনে। ঐ সন্ন্যাসী ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঐ পথ ধরেই যাচ্ছিলেন। সন্ন্যাসীর নাম দণ্ডিস্বামী নিগমানন্দ তীর্থ মহারাজ। উনি ছিলেন কাশীর সুমেরু মঠের মহন্ত। [২০] বেড়িয়েছিলেন তীর্থ পরিক্রমায়। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মহাপ্রভু দর্শনের পর তারাপীঠ তীর্থের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকের দিকে এগুতেই সাপটি মাথা নীচু করে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল। সন্ন্যাসী বালকটির ঘুম ভাঙ্গিয়ে নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন এবং ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের ভিতর ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে

(২০) দণ্ডিস্বামী নিগমানন্দ তীর্থ ১৪৯৪ হতে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুমেরু মঠের মহন্ত ছিলেন।

এলেন। বালক বসন্তর উপনয়ন ও দীক্ষা আগেই হয়েছিল। সন্ন্যাসী বালকের মধ্যে রাজলক্ষণ দেখেছিলেন, তাই তিনি প্রথমে অনুমান করতে পারলেন না যে, রাজা হওয়ার পরিবর্তে গোচারণ বৃত্তিতে যাওয়ার কারণ কি থাকতে পারে ? সেইজন্য বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হল এবং পরে জানতে পারলেন, ছেলেটির ইষ্টমন্ত্রে এক অক্ষর ভুল আছে। এই ঘটনাটি প্রকাশ করে সন্ন্যাসী মহারাজ বসন্তর কুলগুরুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে বসন্তর মাকে অনুরোধ করলেন এবং আরও বললেন যে, বসন্তর ইষ্টমন্ত্রটি শুদ্ধ করে দিলে সে অনতিবিলম্বে রাজা হবে। এই সংবাদে বসন্তর বিধবা মা অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা হয়ে নিকটবর্তী গুরুদেবের বাড়ি নিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী মহারাজকে। সেখানে দণ্ডিসন্ন্যাসী বসন্তর কুলগুরুকে ইষ্টমন্ত্রটি ত্রুটিমুক্ত করতে অনুরোধ করলে তিনি আপত্তি জানান। অগত্যা সন্ন্যাসী মহারাজ একটি বিল্বপত্রে মন্ত্রটি লিখে বসন্তকে সেটি জলে ভাসিয়ে দিতে বললেন। সেই সন্ধ্যাতেই দণ্ডিস্বামী বসন্তকে শুদ্ধ ইষ্টমন্ত্র দান করলেন এবং যাবার আগে শুদ্ধাচারে প্রত্যহ ইষ্টমন্ত্রটি জপ করার উপদেশ দিয়ে গেলেন।

ঘটনাক্রমে গৌড়ের নবাব আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা হতে বীরভূমের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক ধরে গৌড়ে ফিরছিলেন। সম্ভবতঃ দীর্ঘ যাত্রার বিরতি দিয়ে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রামহেতু ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ঐ শিবির হতে বেগম সাহেবার একটি প্রিয় পোষা বাজপাখী সোনার শিকল কেটে উড়ে পালিয়ে যায়। বালক বসন্ত অন্যান্য রাখাল বালকের মতো পাখী ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন গাছের ডালে। পলাতক বাজপাখী ধরা পড়ে গেল তাঁর পাতা ঐ ফাঁদে। বাদশাহী পাখী ! পায়ে সোনার শিকল, নাকে সোনার নোলক। মহা আনন্দে পাখীটাকে ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। ওদিকে বেগম সাহেবা তাঁর হারানো পাখীর শোকে শয্যা নিলেন আর বাদশা বাজপাখীটি ফিরে পাবার চেষ্টায় দিকে দিকে ঢেঁরা দেওয়া করালেন এবং ঐ সঙ্গে প্রচার করালেন, যে ঐ পাখীটি ধরে এনে দেবে, তাকে অপ্রত্যাশিত পুরস্কার দেওয়া হবে।

দণ্ডিসন্ন্যাসী তখন খুব বেশীদূর যান নি । তাঁর কানেও এসে

পৌছুলো বাদশার এলান। তীর্থযাত্রা বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি ফিরলেন নবদীক্ষিত শিষ্য বসন্তর কুটীরে। সন্ন্যাসী বুঝতে পেরেছিলেন বসন্তর রাজ্যপ্রাপ্তির যোগাযোগ আসন্ন। তাই শিষ্যের ঘরে ঝুড়িঢাকা বাজপাখী দেখে সন্ন্যাসীর খুবই আনন্দ হল। পরের দিনই তিনি সশিষ্য বাদশার শিবিরে পৌছে বেগম সাহেবার বাজপাখী প্রত্যর্পণ করলেন আর হোসেন শাহ্‌র নিকট বসন্তর দারিদ্রের কথা জ্ঞাপন করে কিছুটা ভূখণ্ড চেয়ে বসলেন। হোসেন শাহ্ চিরকালই ফকির-সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত সম্মান দিতেন। তিনি দ্বিরুক্তি না করে আদেশ দিলেন, পরদিন সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাখাল বালক বসন্ত যতটা ঘুরে আসতে পারবে, সেই সমস্ত ভূমি তিনি তাঁকে নিষ্কর জমিদারীরূপে দান করবেন। পরের দিন বাদশাহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্বারকা নদীর পশ্চিম দিক বরাবর বৃত্তাকারে প্রায় ষোলো কিলোমিটার ব্যাসের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পরিক্রমা করে ফেললেন বালক বসন্ত।[২১] সঙ্গে থাকা আমিন স্থানে স্থানে ঐ ভূখণ্ডের সীমারেখা চিহ্নিত করে দিল।

এদিকে সকাল হতেই শিবিরের কিছু কিছু অংশ গুটানো শুরু হয়েছে। নৈশভোজের পর হোসেন শাহ্ গৌড়ের পথে রওনা হবেন। বসন্ত পরিক্রমা শেষে শিবিরে পৌছুতেই তিনি সনদ লেখার জন্য মুন্সীকে নির্দেশ দিলেন। সনদ লেখা হল কিন্তু বাদশা ততক্ষণে আহারে বসেছেন। সন্ন্যাসী প্রমাদ গণলেন। উপায়ন্তর না দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে বসন্তর হাতে সনদখানি দিয়ে সম্রাটের আহারস্থলেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। গৌড়েশ্বর কিছুমাত্র বিরক্ত হলেন না বরং সই করবার জন্য

---

(২১) সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূম জেলার নক্সা জোড়া লাগিয়ে দেখা যায় প্রাথমিক পর্য্যায়ে মলুটী নান্‌কার তালুকের আকার ডিমের ন্যায় গোলাকার ছিল। পরবর্তীকালে অনেক মৌজা মলুটীর জমিদারীতে সামিল হয়েছে আবার কয়েকটি হাতছাড়া হয়ে, শেষের দিকের আকৃতি, পূর্ব - আকৃতি হতে কিছুটা ভিন্ন দেখা যায়। নান্‌কার তালুকের আকার গোলাকার হওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে রাজত্ব পাওয়াটা অসম্ভব বলে মনে হয় না। এছাড়া ১০/১১ বা ১২ বছরের বালকের পক্ষে প্রশিক্ষিত বাদশাহী ঘোড়ায় চড়ে সারাদিনে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মত পরিধি পরিক্রমা করা অস্বাভাবিক নয়।

কালি-কলমের অপেক্ষা না করেই এঁটো হাতের পাঞ্জা এঁকে দিলেন দলিলের উপর।

নটকীয় ভাবেই বাদশা হোসেন শাহ্‌, বসন্তর পরিক্রমা করা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি নান্‌কার রাজ অর্থাৎ নিস্কর রাজ্য বলে স্বীকৃতি দিলেন। সঙ্গে দিলেন কিছু অর্থ এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত হিন্দু সৈন্য। ঐ সঙ্গে রাজা উপাধিও খেলাত দিলেন তিনি। বাজপাখীর বদলে রাখাল বালকের রাজ্যলাভ তাই পুরাতন নথিপত্রে ও ইতিহাসে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা বাজবসন্ত বলে। ঐ পাঞ্জাটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, পাঁচশো বছর আগে দেওয়া কাগজের দলিলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবও নয়। কথিত আছে ই. আই. আর. লুপ লাইনটি তৈরী হওয়ার সময় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মলুটীর রাজাদের এক মোকর্দ্দমা হয় এবং পাঞ্জাটি কলকাতার তদানীন্তন হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছিল। মোকর্দ্দমা শেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ পাঞ্জাটি আর ফেরৎ দেয় নাই। ইদানীং কালে, অপেক্ষাকৃত একটি আধুনিক দলিলে সনদের দ্বারা নান্‌কার রাজ্য প্রাপ্তি ও নান্‌কারের জমিদারদের রাজা উপাধির উল্লেখ আছে। দলিলটির মুখবন্ধে দেওয়া আছে ঃ—

" .... বর্তমান জেলা সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূমের অন্তর্গত বীরভূম কালেক্টারীর ৪৪৯ নং তৌজিভুক্ত সিক্‌মী তালুকদার নান্‌কার, বাদশাহের প্রদত্ত সনদমূলে মলুটীর রাজা নামে খ্যাত, আপনাদের পূর্ববর্তী মালিকীসত্ত্বে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন .... "[২২]

বাজবসন্তর বাজপাখী পাওয়ার আগে তিনি একজন সামান্য রাখাল ছিলেন এবং এক সন্ন্যাসী তাঁকে মাঠের উপর রৌদ্রের মধ্যে নিদ্রা যেতে দেখেছিলেন। সেই সময় তাঁর মুখের উপর সূর্য্যকিরণ পড়ছিল। সূর্য্যকিরণের জন্য যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এক বিশাল বিষধর সাপ ফণা তুলে সেই সূর্য্যতাপ নিবারণ করেছিল। সন্ন্যাসী কাছে আসতেই সাপটি মাথা নীচু করে অন্যত্র চলে যায়। কিম্বদন্তীর মধ্যে বাজপাখীর

(২২) বর্দ্ধমানের মহারাজার তরফ হতে মল্লারপুর এস্টেটের মহন্ত ভগবান দাসের সঙ্গে মলুটীর রাজাদের রেজেষ্ট্রীকৃত কবুতলী পাট্টা। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী রামপুরহাট রেজেষ্ট্রী অফিসে রেজেষ্ট্রী করা দলিলের আংশিক প্রতিলিপি।

সাহায্যে রাজত্ব পাওয়া ছাড়াও রাখালবৃত্তি করা এবং সর্প সম্বন্ধীয় অলৌকিক ঘটনাটি রাজা বাজবসন্তর জীবনীর সহিত জড়িত আছে কিন্তু ঐ ঘটনাদয় হঠাৎ রাজা হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচলিত, যার জন্য এই দুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। কারণ, "কিম্বদন্তীগুলি গল্পের আকারে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসে এবং প্রতি প্রজন্মেই সময়োপযোগী কিছু বাড়তি রং দিয়ে উপাদেয় করা হয়। এই সব কিম্বদন্তীর কোন বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় না। তথাপি কিম্বদন্তীগুলি প্রায় মূল ঘটনার সূত্র দিয়ে থাকে এবং স্থানীয় ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে।"[২৩] সেই জন্য রাজা বাজবসন্ত, তাঁর বংশধর রাজা রাখড়চন্দ্র অথবা রাজবংশের কুলদেবী মৌলীক্ষা মা সম্বন্ধে বহুলপ্রচারিত বেশ কিছু কিম্বদন্তী মলুটী নান্‌কার রাজ্যের ঐতিহাসিক পটভূমির অনেকাংশে ও অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদশা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌, যিনি রাজা বাজবসন্তকে রাজত্ব দিলেন তাঁর নিজের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দুটি, যথা বাল্যকালে রাখালবৃত্তি ও রাজ্য পাবার পূর্বে বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে সেই রাখালের সুপ্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল হতে রৌদ্র নিবারণ ক্রিয়া জড়িত আছে। " .... গণকর অঞ্চলে জনশ্রুতি এই যে, হোসেন শাহ্‌ বাল্যে তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের গোরক্ষক নিযুক্ত ছিলেন এবং উপকথার রাজগণের সনাতন নিয়মে সুপ্ত বালকের শিরোপরি ফণা বিস্তার করিয়া এক কালসর্পও আতপ নিবারণ করিয়াছিল।"[২৪] একই প্রক্রিয়ায় জমিদারী লাভ আরও অনেকের জীবনে জড়িত আছে। যেমন " .... এক মাহাতো মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছিল তখন এক বিরাট সাপ ফণা তুলিয়া তাহার মুখ হইতে রৌদ্রতাপ নিবারণ করিয়াছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই মাহাতো একজন রাজা হয় এবং তালুকের নামও সাপচলা তালুক রাখা হয়।"[২৫] তবে বাজপাখী ধরে নিস্কর (নান্‌কার) জমিদারী লাভ সম্ভবতঃ সত্য। প্রচলিত কিম্বদন্তীর প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে যে অংশটুকু থাকে সেটা হচ্ছে বাজপাখীর বদলে ঘোড়ায় চড়ে বৃত্তাকারে ঘুরে

*(২৩) **G. D. Mukherjee - Temples of Maluti, Page 21***

(২৪) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় - মধ্যযুগে বাঙ্গলা, পৃঃ - ২৮

(২৫) ম্যাকফার্সন রিপোর্ট - ১৮৮৫

এক বিস্তৃত ক্ষেত্রের জমিদারী লাভ। সম্ভবতঃ এই অংশটুকুই কিম্বদন্তীর মূল বিষয়।

বাজপাখীর বদলে রাখাল বসন্তর রাজা হওয়ার কাহিনীটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় কাশী সুমেরু মঠের মহন্ত দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ মহারাজের (১৯০৮-১৯১১) লিখিত একটি পুস্তিকায়। [২৬] ঐ পুস্তিকায় লিখিত কাহিনীটি বেশ বড়। ঐটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এই প্রকার — কাশীর সুমেরু মঠের মহন্ত দণ্ডিস্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থ এক সময় তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষ্যে কাশী ত্যাগ করে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখান হতে তারাপীঠ যাবার পথে মৌড়েশ্বর গ্রামের পাশে জঙ্গলপ্রান্তে এক রাখাল বালককে নিদ্রাভিভূত দেখতে পান। ঐ সময় 'একটি কৃষ্ণকায় বৃহৎ কালসর্প ঐ বালকের মস্তকে ফণা ধরিয়া সূর্য্যকিরণ রোধ করতঃ বালকের মুখমণ্ডল রবির কিরণজাল হইতে রক্ষা করিতেছিল। দণ্ডিস্বামী এই দৃশ্য দেখে এর নিগুঢ়তত্ত্ব চিন্তা করিলেন।' লোকের আবির্ভাবে সাপ পালিয়ে গেল এবং বালকের নিদ্রাভঙ্গ হল। এরপর স্বামীজী এবং বালকের মধ্যে দীর্ঘ কথপোকথন হয়। এই কথাবার্তায় বালকের নাম বসন্ত, তিনি পিতৃহীন এবং রামমোহন ভট্টাচার্য্যের ঘরে গোরক্ষকের কাজে লিপ্ত বলে প্রকাশ পায়। সন্ন্যাসী বালকের মধ্যে রাজলক্ষণ দেখে অনুসন্ধানের পর বুঝতে পারলেন বসন্তর দীক্ষামন্ত্রে এক অক্ষর ভুল আছে। মন্ত্রটি শুদ্ধ করবার জন্য বসন্তর মাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামেই গুরুবাড়ি গেলেন এবং মন্ত্রটি শুদ্ধ করে দিতে অনুরোধ করলেন। গুরু রাজী হলেন না বরং অসন্তুষ্ট হয়ে বসন্তকে 'অল্পায়ু হও' বলে অভিশাপ দিলেন। ঐ দিনই সন্ন্যাসী নূতন করে সিদ্ধমন্ত্র দিয়ে সাত দিনের মধ্যে রাজা হবার কথা বলে চলে গেলেন।

চতুর্থ দিনের সকাল বেলায় হঠাৎ একটি বাজপাখী বসন্তর হাতে এসে বসল। বসন্ত পাখীটি ঘরে এনে গোপনে রেখে দিলেন। পাখীটি ছিল একজন নবাবের বেগমের। এইবার বসন্ত নবাবকে পাখীটি ফেরৎ দিয়ে কিছুটা ভূখণ্ড ভিক্ষা করলেন। এরপর রয়েছে যথারীতি ঘোড়ার পিঠে

(২৬) *দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ - শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন (কাশীর সুমেরু মঠ হতে প্রকাশিত)।*

চড়ে চতুর্দিকে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ পরিক্রমা ও নিস্কর রাজ্যলাভ। পরে গুরুর আদেশে রাজা বাজবসন্ত মৌড়েশ্বরে রাজবাড়ী নির্মাণ করে নান্‌কার রাজ্য স্থাপন করলেন। কাশীর সুমেরু মঠ হতে 'শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন' নামক পুস্তিকাটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রকাশিত হয়। এর তেরো বছর পর এক স্থানীয় লেখকের পুস্তকে [২৭] ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। পূর্বোক্ত পুস্তিকায় উল্লেখিত 'একজন নবাব' পরে প্রকাশিত পুস্তকটিতে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি হয়ে গেছেন। গল্পের বাকি অংশ একই রয়ে গেছে। তদানীন্তন বীরভূমে নান্‌কার তালুকের বর্ণনায় এই গল্পটিই আবার উদ্ধৃতি হিসাবে 'বীরভূমের ইতিহাস' [২৮] এবং 'বীরভূম বিবরণ' [২৯] নামক গ্রন্থদ্বয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তবে উভয় পুস্তকেই কোন নবাবের নাম নাই। কেবল একজন নবাবের বাজপাখী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৩১৭ বঙ্গাব্দের (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের) 'প্রবাসী' প্রত্রিকার একটি নিবন্ধে বাজপাখীটি মুর্শিদাবাদের নবাবের বলা হয়েছে।

(২) নান্‌কার রাজ্য স্থাপনার সময়

নান্‌কার শব্দটি নন্‌কর শব্দের অপভ্রংশ। নান্‌কার রাজ্যের অর্থ নিষ্কর বা করমুক্ত রাজ্য। এই রকম তালুক ভোগ করার জন্য সরকারকে, সে সরকার, নবাব, বাদশা বা ইংরেজ, যার দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন, কর দিতে হতো না। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিশেষ কৃতিত্ব, আনুগত্য অথবা কার্য্যকুশলতার জন্য সুলতান, নবাব কিংবা রাজার কাছে, ব্যক্তিবিশেষ নিষ্কর জায়গীর অথবা সীমিত ভূমিখণ্ড লাভ করতেন এবং ঐ খাজনাবিহীন ভূখণ্ড দান পেতেন লিখিত সনদ দ্বারা। তদানীন্তন কালে এটিকে অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কার হিসাবে ধরা হত। পরবর্তী সুলতান, নবাব বা রাজাগণ বংশানুক্রমে ঐ সনদের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে এসেছেন । রাজপরিবারের ধারা পরিবর্তনেও সনদের

(২৭) *ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় - মলুটী রাজবংশ*

(২৮) *গৌরীহর মিত্র - বীরভূমের ইতিহাস (২য় খণ্ড)*

(২৯) *হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - বীরভূম বিবরণ (২য় খণ্ড)*

অধিকার ক্ষুন্ন করা হয় নাই। "১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সঙ্গে মুসলমান শাসনের অবসান হয়। তার আঠাশ বছর পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭নং রেগুলেশন দ্বারা, কোম্পানী বাংলায় প্রচলিত ভূমিকরের আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, তখনও ১৭৬৫ সালের আগে সনদপ্রাপ্ত নান্‌কার তালুকগুলিকে বাদশাহী সিদ্ধ নিস্কর বলে গণ্য করে নেয়। এইগুলির নাম দেওয়া হয় বাদশাহী বা তায়দাদ"। [৩০] মলুটী নান্‌কার তালুক ছিল এই প্রকারের একটি বাদশাহী সিদ্ধ নিস্কর তালুক।

মলুটী নান্‌কার রাজ্যের উৎপত্তির সময় সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, সেটি হ'ল, দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রদত্ত সনদে এই নিস্কর ভূভাগ মলুটীর রাজাদের হাতে আসে। সেই সনদ বর্তমানে না পাওয়ার জন্য জনশ্রুতির সময় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। নানাভাবে অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে, এই জনশ্রুতির প্রকৃত উৎস ছিল সর্বপ্রথম 'শিবলীলা' ও পরে 'মলুটী রাজবংশ' নামে দুইখানি পুস্তক। ঐ পুস্তকদ্বয়ে লিখিত আছে যে, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বর গ্রামের পাশে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানেই সনদখানি মলুটীর রাজাদের পূর্বপুরুষকে দেন। এই ঘটনা অত্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ, কেননা, প্রথমতঃ আলাউদ্দিন খিলজির বঙ্গদেশে আসার কোন নজীরই ভারতের ইতিহাসে নাই। সেই সময় বঙ্গদেশের নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী। "তিনি (আলাউদ্দিন খিলজি) একবার মাত্র দক্ষিণাপথ আক্রমণ করার আগে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।" [৩১]

দ্বিতীয়তঃ আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হতে ৭০০ বছর আগে দিল্লীর সুলতান হন। তাঁর সনদে যদি নান্‌কার রাজ্যের প্রথম রাজা বসন্ত রায় (বাজবসন্ত) রাজা হয়ে থাকেন তবে তিনি ও তাঁর পরবর্তী রাজারা প্রায় চারশ বছর অর্থাৎ ইতিহাসের হিসাব অনুযায়ী বারো পুরুষ মলুটীর বাইরে থেকে নান্‌কার রাজ্যের পরিচালনা করেছিলেন, কেননা

---

(৩০) গৌরীহর মিত্র - বীরভূমের ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০৭

(৩১) Elliots History of India Vol II, Page 152

রাজবসন্তের বংশধরগণ মাত্র তিনশো বছর আগে আনুমানিক ১৬৯০ হতে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মলুটীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় ব্যাপারে কিছুটা প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় যে, মলুটীতে রাজধানী স্থাপনের পর রাজার বাড়ির প্রথম রাজা রাখড়চন্দ্রের নির্দেশে নির্মিত একটি মন্দিরে সময় লেখা আছে ১৬৪১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মলুটী গ্রামকে নান্‌কার রাজ্যের রাজধানী করা হয়েছিল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই। মলুটী আসার পূর্বে আগের রাজধানী ডামরা গ্রামে প্রথম রাজা বাজবসন্ত হতে রাজা রাজচন্দ্র পর্যন্ত মলুটী নান্‌কার রাজ্যের মাত্র চারজন রাজার প্রকাশ্য ও দুইজন রাজার অপ্রকাশিত নাম পাওয়া যায়। ইতিহাসের সময় গণনার নিয়মে পূর্ব রাজধানীতে তাঁরা ১৫০ হতে ১৭০ বৎসর ধরে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এই হিসাবে মলুটীর নান্‌কার রাজ্যের স্থাপনা আলাউদ্দিন খিলজির পরিবর্তে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র দেওয়া সনদে হয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (১৪৯৫-১৫২৫) [৩২] ছিলেন পূর্ব ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। "তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীও হোসেন শাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।" [৩৩] সেই সুলতান "হোসেন শাহ্ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে সসৈন্যে স্বয়ং উড়িষ্যায় যুদ্ধ যাত্রা করেন।" [৩৪] উড়িষ্যা হতে ফেরার পথে তিনি বসন্তকে নিস্কর রাজ্য দান করেন। অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ১০-১১ বৎসর বয়সে রাখাল বসন্ত রাজা লাভ করে থাকবেন।

তৃতীয়তঃ মলুটী নান্‌কার রাজ্যের সীমানা বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বর হতে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা বিভাগের (তদানীন্তন নামও ছিল ঝাড়িখণ্ড) [illegible] ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খিলজি প্রদত্ত সনদে এই রাজ্যের উৎপত্তি হলে চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় অর্থাৎ খিলজির আরও দুশো বছর পরে নিঃসন্দেহে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য হয়ে থাকার কথা। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবতে' দেখা যায় চৈতন্যদেবের পারিষদবর্গের অন্যতম

---

(৩২) রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস, পৃঃ ২২৪

(৩৩) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ), পৃঃ ২৮৭

(৩৪) রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস, পৃঃ ২২৭

প্রধান, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নবদ্বীপবাসীগণ যাঁকে বলরামের অবতাররূপে বিশ্বাস করতেন, তাঁর বীরভূম পরিক্রমা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি এক সময় বীরভূমের মৌড়েশ্বর গ্রামেও পৌঁছান এবং সেখানে মৌড়েশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন —

> "মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
> যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে।"[৩৫]

শ্রীচৈতন্যদেবের উপর লিখিত অন্য একটি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের স্বয়ং মথুরা যাবার জন্য ঝাড়িখণ্ড জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাত্রা করার বর্ণনা রয়েছে। যেমন —

> "মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়িখণ্ড।
> ভিল্ল প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড।।
> নাম প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার
> চৈতন্যের গূঢ় লীলা বোঝে শক্তি কার।।"[৩৬]

ঐ গ্রন্থদ্বয়ে চৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় ঘটনা ছাড়াও, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বর্ণনা বিশদভাবে দেওয়া আছে। জনশ্রুতির সময়কে ভিত্তি করলে, মৌড়েশ্বর তখন নান্‌কার রাজ্যের প্রভাবাধীন এবং ঝাড়িখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃহৎ অংশ নান্‌কার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত অথচ এই বই দুখানিতে বা চৈতন্যদেবের অন্যান্য জীবনীকারের লেখনীতেও মৌড়েশ্বরে বা মৌড়েশ্বর সংলগ্ন ঝাড়িখণ্ডে নান্‌কার রাজ্য বা ঐ বংশের কোনও রাজা অথবা তাঁদের কোনরকম কীর্তিকলাপ ইত্যাদির উল্লেখ নাই, যদিও আলোচ্য পুস্তক দুইখানি সমকালীন প্রামাণ্য ইতিহাস বলে স্বীকৃত হয়ে আছে। এ থেকেও অনুমান করা অসংগত হবে না যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় (১৪৮৫-১৫৩৪) এই নান্‌কার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে নাই।

রাজা বাজবসন্তর রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে কাশী সুমেরু মঠের দণ্ডিস্বামীর একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। তিনি রাখাল বসন্তকে দীক্ষা দিয়ে রাজপদ পেতে সাহায্য করেন এবং তখন থেকেই ঐ মঠের মঠাধীশগণ শিষ্য

(৩৫) বৃন্দাবন দাস - চৈতন্য ভাগবত

(৩৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজ - শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা পৃঃ ১৯৬

পরম্পরায় মলুটীর রাজাদের গুরু। জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য্য ভারতের চতুর্দিকে চারটি মঠ যথা — পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকা ক্ষেত্রে সারদা মঠ ও কেদার-বদরী ক্ষেত্রে যোষী মঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া "৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক স্থাপিত হয় ভবানী ভদ্রকালী দেবীর কুটীর ও শঙ্করাচার্য্যের আসন। গোদাবরীর দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ইহা কাশীধামের গণেশ মহল্লায় অবস্থিত।"[৩৭] এটি সুমেরু মঠ নামে পরিচিত। এই সুমেরু মঠের মঠাধীশগণের আনুক্রমিক অভিষেককালের বর্ণনা দিয়ে শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী একটি পুস্তিকা * কয়েক

(৩৭) দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ — শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন, পৃঃ ২

** জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ আদি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীর সুমেরু মঠের মঠাধীশগণ, কাশীর রাজা এবং মলুটীর রাজাদের রাজগুরু। দণ্ডিস্বামী নিগমানন্দ তীর্থ মহারাজকে মলুটীর প্রথম রাজা বাজবসন্ত গুরুপদে বরণ করেন। প্রথম রাজগুরু হতে বর্তমান গুরু পর্যন্ত মঠাধীশগণের আনুক্রমিক অভিষেককাল নিম্ন প্রকার — "(১) নিগমানন্দ - ১৪৯৪, (২) স্বয়ম্ভুবানন্দ - ১৫২৩, (৩) মহাদেবানন্দ - (৫ম) - ১৫৪৮, (৪) অচ্যুতানন্দ - ১৫৭৮, (৫) শিবধ্যানানন্দ- ১৫৯৭, (৬) জগদানন্দ - ১৬২৪, (৭) প্রজ্ঞানন্দ - ১৬৪৭, (৮) সর্বানন্দ (২য়) - ১৬৭৬, (৯) স্বরূপানন্দ - ১৭০৬, (১০) নিরঞ্জনানন্দ - ১৭৩৬, (১১) মহাদেবানন্দ (৬ষ্ঠ) - ১৭৫৭, (১২) স্বয়ংপ্রকাশানন্দ - ১৭৭৫, (১৩) পুরুষোত্তমানন্দ - ১৭৮৪, (১৪) সদাশিবানন্দ - ১৭৯৪, (১৫) বাসুদেবানন্দ (২য়) - ১৮০৭, (১৬) হরিহরানন্দ - ১৮১৬, (১৭) সত্যসন্ধানানন্দ - ১৮৩৪, (১৮) ব্রহ্মানন্দ - ১৮৪৪, (১৯) রাঘবানন্দ - ১৮৫১, (২০) শিবানন্দ - ১৮৬৪, (২১) বিশ্বেশ্বরানন্দ (২য়) - ১৮৮৩, (২২) ব্রহ্মানন্দ - ১৯০৮, (২৩) কালিকানন্দ - ১৯১২, (২৪) সত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দ - ১৯২৪, (২৫) পরমাত্মানন্দ - ১৯৩৬, (২৬) নিত্যানন্দ - ১৯৪৫, (২৭) বিশুদ্ধানন্দ- ১৯৫০, (২৮) আনন্দবোধাশ্রম - ১৯৫৯।*

অন্তিম মঠাধীশের পূর্ববর্তী সকল মঠাধীশেরই উপনাম 'তীর্থ' ছিল। অন্তিম মঠাধীশই 'আশ্রম' নামা। তীর্থনামা মহন্তগণের শিষ্য পরম্পরা বিনষ্ট হওয়ায়, শিষ্যবর্গ মঠরক্ষার্থে আশ্রমনামা হইলেও অন্তিম মঠাধীশকে বিশেষ অনুরোধ করতঃ সম্মত করাইয়া এখানে মঠাধীশরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন।"- শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী রচিত 'রাজগুরু সুমেরু মঠস্য মঠাম্নায়' নামক পুস্তিকা হতে গৃহীত। সুমেরু মঠের বর্তমান মঠাধীশ - দণ্ডিস্বামী অদ্বৈতবোধাশ্রম।

বছর আগে সুমেরু মঠ হতে প্রকাশ করেছেন। ঐ পুস্তিকাটির উৎস সম্বন্ধে উনি লিখেছেন যে, স্বামী সত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দজী (১৯২৪-১৯৩৬) মঠের পুরাতন কাগজ-পত্র ঘেঁটে দণ্ডিস্বামীদের নামগুলি সংকলন করেছেন। যেহেতু সুমেরু মঠের সন্ন্যাসী গুরুগণ প্রতিবৎসরই দোল উৎসবের সময় মলুটী গ্রামে কিছুদিনের জন্য পদধূলি দিয়ে থাকেন সেইজন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মলুটীর উপর লেখা পুস্তক 'মলুটী রাজবংশ' তাঁর হতে পৌছে যাওয়ায় স্বাভাবিক, যাতে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির পাঞ্জায় বসন্ত রাজা হয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। স্বামীজী ঐ ঘটনাকে ঐতিহাসিক আধার মেনে নিয়ে আলাউদ্দিন খিলজির (১২৯৬-১৩১৬) সমসাময়িক মঠাধীশ স্বামী রামানন্দকে (১২৯০-১৩১৫) রাজা বাজবসন্তর গুরু বলে স্থির করে থাকবেন। আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁর পুস্তিকায় [৩৮] রাজা বসন্তর গুরু স্থির করেছেন ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহন্ত হওয়া দণ্ডিস্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থজীকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজা বাজবসন্তর বংশধরগণ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮০-৯০ বৎসর পূর্বেই মলুটীতে রাজধানী স্থাপন করে নান্‌কার তালুক পরিচালনা করছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সময়ের সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, বীরভূম গেজেটীয়ার্স অনুসারে আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালের প্রায় ২৫০ বছর পরে অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এবং তারপরেও নান্‌কারের প্রথম রাজা বাজবসন্ত ডামরা গ্রামে রাজত্ব করেছিলেন। সেক্ষেত্রে দণ্ডিস্বামী নিগমানন্দ মহারাজই (১৪৯৪-১৫২৩) রাজা বসন্তর গুরু হয়ে থাকবেন।

উপরোক্ত নেতিবাচক ও ইতিবাচক তথ্যগুলির আধারে তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিসাব করতে গেলে এই রাজ্যের উৎপত্তির সময়সীমা ষোড়শ শতাব্দীর পিছনে যেতে পারে না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে দেখা যায় গৌড়ের হোসেন শাহ্ বিশাল ভূখণ্ডের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং এইটিই যুক্তিযুক্ত যে, গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহ্‌র সনদ বলে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নান্‌কার রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। ঘটনাক্রমে "হোসেন শাহ্ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ নাম

(৩৮) দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ — শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন, পৃঃ ৩০

গ্রহণ করেন।" [৩৯] আলাউদ্দিন বলতে সাধারণতঃ খিলজিকেই ধরা হয়। কেননা, দিল্লীর সম্রাট তুলনামূলকভাবে ইতিহাসে অধিক পরিচিত। তাই এই আলাউদ্দিন নিশ্চিতভাবে গৌড়ের হোসেন শাহ্। উভয় নাম এক হওয়ার জন্য সময়ের প্রমাদ ঘটেছে।

হোসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধরগণের রাজত্বকাল মুসলমান যুগের ইতিহাসে গৌড়বঙ্গে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সময়। ঐ সময় হোসেনশাহী সুলতানগণ বংশ-পরম্পরায় গৌড়বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দান-ধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যার জন্য হোসেন শাহের সনদে এই নান্‌কার রাজ্যের উৎপত্তি অনুমান করলে ঐতিহাসিক সত্য অমূলক হবে না।

(৩) নান্‌কার রাজ্যের রাজাগণ

রাজা বাজবসন্ত

(১৫২০-১৫৭০ আনুমানিক রাজত্বকাল)

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ	বীরভূমের রাজাগণ
হোসেনশাহী, সুর ও কররানী বংশ	রাজা বীরসিংহ (১৫৬০ পর্যন্ত)
(১৪৯৩-১৫৭৬)	রাজা জোনাদ খাঁ (১৫৬০-১৬০০)

রাজা বাজবসন্ত বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বরের নিকটবর্তী কাটিগ্রাম নামে একটি ছোট গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মলুটীর রাজাদের আদি বাসস্থান প্রসঙ্গে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের বীরভূম সেটেলমেন্ট রিপোর্টের Statement of plots connected with local tradition or Historical importance এর Coloumn এ লিখিত মন্তব্যটি এই প্রকার – The original house of Maluti Raj Family - Katigram JL No. 59, Plot not traceable. [৪০]

অন্যদিকে কাটিগ্রাম প্রথম হতে জমিদারী বিলোপ পর্য্যন্ত মলুটীর

(৩৯) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ), পৃঃ ২৪২

(৪০) Final Report on the survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924 - 32 - Appendix - XII

জমিদারীর অধীনেও ছিল, যার জন্য মলুটী রাজবংশের আদি রাজার বাসস্থান যে কাটিগ্রাম এসম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে তাঁর প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল এব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। রাজা বাজবসন্ত রাজ্যপ্রাপ্তির পর যেভাবে মৌড়েশ্বর গ্রামে দুর্গ ও রাজবাড়ী নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দজী লিখেছেন "................ বসন্ত শ্রীগুরুর উপদেশ মত আপন রাজ্যরক্ষার উপায় করিয়া চতুর্দিকে পরিখা নির্মাণ করতঃ স্থানে স্থানে দুর্গ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত করিয়া বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর রাজবাড়ী প্রস্তুত করিলেন। তদানীং নাম মৌড়েশ্বর ছিল।" [৪১] দণ্ডিস্বামীর এই বর্ণনা তথ্যভিত্তিক নয়। কেননা, মৌড়েশ্বর একটি প্রাচীন গ্রাম। এর পূর্ব নাম ছিল কোট মৌড়েশ্বর। "মৌড়েশ্বর তখন 'কোট' অর্থাৎ প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ ছিল। জনশ্রুতি আছে মৌড়েশ্বরে মুকুট রায় নামে এক রাজা ছিলেন। রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপও এই গ্রামে ছিল শুনা যায়।" [৪২] জনশ্রুতির এই মুকুট রায় কিন্তু নবদ্বীপের সমীপবর্তী পূবজলের (পূর্বস্থলীর) জনৈক বীরধর্মী ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। "তিনি দিল্লীর বাদশা ফিরোজ শাহ্‌র (১৩৫১-১৩৮৮) নিকট পাঞ্জা পাইয়া বর্তমান পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বর্দ্ধমান এইসব জেলার জমিদার হন।" [৪৩] অন্যত্র মুকুট রায় সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "এই ব্রাহ্মণ যোদ্ধপুরুষ নবদ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রগড়ের সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নায়ক। এই প্রাচীন স্থান কাটোয়া হইতে কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'সাতসাইকা' (সপ্তশতী) পরগনার রাজধানী। সাতশতী ব্রাহ্মণ সুদীর্ঘকাল ইহা অধিকার করিয়া আসিয়াছেন।" [৪৪]

বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের মত অনুযায়ী দেখা যায় রাজা বাজবসন্তর অনেক আগে হতেই সপ্তশতীকা বা সাতসাইকা পরগনার রাজধানী ছিল মৌড়েশ্বর। রাজবাড়ি অথবা দুর্গের ধ্বংসস্তূপ শপ্তশতী রাজাদের রাজত্বের নিদর্শন হওয়ায় অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ। অপরদিকে রাজা বাজবসন্ত রাজ্যপ্রাপ্তির পর ডামরা গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন তার উল্লেখ সরকার-স্বীকৃত

---

(৪১) দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ - শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন, পৃঃ ৩৪

(৪২) দেবকুমার চক্রবর্ত্তী - বীরভূমের পুরাকীর্তি, পৃঃ ৬৯

(৪৩) রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী - গৌড়ের ইতিহাস

(৪৪) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় - মধ্যযুগে বাংলা, পৃঃ ৪৩৯

পুস্তকে, স্থানীয় ইতিহাসে এবং বহুল প্রচারিত জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। মল্লারপুর নিবাসী "কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত গত ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকার পটুয়াখালীর সখা প্রেস হতে মুদ্রিত মল্লেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি কবিতা পুস্তকের শেষ অংশে নান্‌কারের রাজা বসন্তরায়ও স্থান পেয়েছেন। সেখানে ডামরা গ্রামকে বসন্ত রায়ের রাজধানী বলা হয়েছে। কবিতার ঐ অংশটি এই প্রকার —

> "মল্লরাজ্য অবসানে গ্রাম ডামরায়।
> ব্রাহ্মণ রাজত্ব এক প্রাদুর্ভূত হয়।
> যেরূপে ডামরা রাজ্য হয় প্রতিষ্ঠিত।
> সংক্ষেপে কহিব কিছু জনশ্রুতি মত।"

জনশ্রুতি অনুযায়ী এর পরে আছে দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিন মল্লারপুর সংলগ্ন বনে মৃগয়া করতে এসেছিলেন এবং সেখান হতেই তাঁর প্রিয় বাজপাখী হারিয়ে যায়, তার বর্ণনা ও সেই পাখীকে ধরে দিলে জায়গীর পুরস্কার দেবার ঘোষণা —

> "বহু অন্বেষণে নাহি পাইয়া পাখীরে।
> চৌদিকে ঘোষণাপত্র প্রচারে অচিরে।।
> যে ধরিয়া দিবে এই পক্ষী বাদসারে।
> জায়গীর পুরস্কার মিলিবে তাহারে।।
> বসন্ত নামক কোন ব্রাহ্মণের ঘরে ।
> বসে বাজ মংসখণ্ড দিয়া তারে ধরে।।
> পাখী দিয়া বাদসারে করিলেক প্রীত।
> রাজাখ্যা খেলাত সহ হইল অর্পিত।।
> নান্‌কার ভূসম্পত্তি পাইয়া ব্রাহ্মণ।
> ক্রমশঃ বিস্তারে রাজ্য অতি সুশোভন।।" [৪৫]

রাজা বাজবসন্তর রাজ্য বিস্তারের কথা কবিতার একটি পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, বিশদ বর্ণনা দেওয়া নাই। কবিতার পরের অংশে আছে ডামরা ও মল্লারপুরে নান্‌কার রাজাদের কিছু রাজকীয় কীর্তির বর্ণনা।

---

(৪৫) কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — শিবলীলা, পৃঃ ২০-২১
(মল্লারপুর নিবাসী শ্রীঅশোককুমার সাহা মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য)

কবিতায় উল্লেখ আছে মল্লরাজ্যের অবসানে বসন্তর রাজ্যলাভ। 'বাঁকুড়ার মন্দির' পুস্তকে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মল্লরাজ্যের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। সেক্ষেত্রে রাজ্যের পতন আরও আগে হতে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেই শুরু হয়ে থাকবে। এই পরিপেক্ষিতে এবং পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রাজা বসন্তর দ্বারা নান্‌কার রাজ্যের স্থাপনা ডামরা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হয়েছিল অনুমান করা যায়। ডামরা গ্রামে পুরাতন রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আজও বর্তমান। ধ্বংসস্তূপের চতুর্দিকে পাতলা ইঁটের অজস্র টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে।

বসন্তর রাজ্যলাভের কিছু পর হতেই বীরভূম জেলাসহ সমগ্র গৌড়বঙ্গে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নান্‌কারের যুবক রাজা বসন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে রূপায়িত করে চলেছিলেন। সেই মাৎস্যন্যায়ের দিনে সাহসী রাজা বসন্তকে অনেকদিন কেউ বাধা দিতে পারেন নাই।

গৌড়ে তখন শাসনকর্তা পরিবর্তন হচ্ছে অতি দ্রুত। কয়েক বৎসরের মধ্যে হোসেনশাহী বংশের পতন ঘটিয়ে স্বল্পকালের জন্য রাজত্ব করলেন যথাক্রমে সুর ও কররানী বংশের সুলতানগণ। হুমায়ুন গৌড় আক্রমণ করে এক শাসনকর্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন কিন্তু পরের বৎসরই শেরশাহ্ মগধ এবং গৌড়দেশ মোগলশূন্য করে নূতন এক সুলতানকে বসিয়ে গেলেন গৌড় বঙ্গের তক্তে। আবার তাঁকে ইচ্ছামত বিদায় দিয়ে অপর এক সুলতান নিযুক্ত করেছেন। রিয়াজ-উস-সলাতীন অনুসারে "শেরশাহ্ ৯৪৬ হিজরায় (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) এক বৎসর কাল গৌড়ে বাস করিয়া বিশৃঙ্খল গৌড়রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন"। [৪৬] হান্টার সাহেব, পণ্ডিত নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হতে স্থানীয় জনশ্রুতি, সংস্কৃত পুস্তক এবং পারিবারিক খাতাপত্রের সাহায্যে গৌড় তথা বীরভূমের সেই সময়কার অবস্থা যা যোগার করেছিলেন তার মধ্যে দেখা যায় "১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ পাঁচলক্ষ আফগান সৈন্যের সাহায্যে

(৪৬) রিয়াজ-উস্-সলাতীন- ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১৪৫

কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। পর বৎসর তিনি গৌড়ে আসেন এবং সমগ্র গৌড়কে কয়েকটি জেলায় ভাগ করে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলাধীশ নিযুক্ত করেন।" [৪৭] ঐ পুস্তকে তিনি তদানীন্তন বীরভূমের দুইজন রাজার কথা উল্লেখ করেন। রাজদ্বয়ের মধ্যে একজন ছিলেন মল্লারপুরের রাজা মল্লারসিং ও অপর জন ছিলেন রাজনগরের রাজা বীরসিংহ।

শেরশাহের বিজয়ের পর হতেই বীরভূমে আফগান ও পাঠান প্রাধান্য বেড়ে যায়। বিভিন্ন সূত্রে এদের মধ্যে কেউ কেউ জায়গীরও লাভ করেন। বীরভূমে মুসলমান জায়গীরদারদের পত্তন সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব লিখেছেন— "শেরশাহের সিংহাসন প্রাপ্তির আগে এবং পরে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বন্য জাতির আক্রমণ হতে বীরভূমকে রক্ষা করার জন্য কয়েকজন মুসলমান সর্দারকে জায়গীর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।" [৪৮] এইসব জায়গীরদারকে ঘাটোয়াল বলা হত। পরবর্তী দুই-তিন দশক ধরে পাঠান ও আফগান সর্দারগণ, সৈন্য ও ভাগ্যান্বেষীর দল বীরভূমে ভীড় লাগাতে থাকে। ঐরূপ ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে দুইজন, বীরভূমের স্বাধীন শাসনকর্তা নগরের বীর রাজার কাছে চাকুরি গ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৫৫৫ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা বীরভূমের হিন্দু রাজাকে হত্যা করে সর্বপ্রথম মুসলমান রাজা হিসাবে বীরভূমের রাজপদ অলঙ্কৃত করেন।

বীরভূমে রাজশক্তি পত্তনের সংগৃহীত ইতিহাসে দেখা যায় যে, "উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হতে আগত বীরসিংহ এবং চৈতন্যসিংহ বীরভূমের দুটি গ্রামে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। গ্রাম দুটির নাম যথাক্রমে বীরসিংহপুর ও চৈতন্যপুর (বর্তমানে রাজনগর থানায় অবস্থিত)। চৈতন্যপুর নাম ভেঙ্গে প্রথমে চৈতঙ্গা এবং শেষে খটঙ্গায় দাঁড়ায়। বীরসিংহ পার্শ্ববর্তী রাজা এবং জমিদারগণকে পরাজিত করে এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় আসাদুল্লা খাঁ এবং জোনাদ খাঁ নামে পাঠান ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর কাছে চাকুরি গ্রহণ করেন। এঁদের সাহসিকতার জন্য বীরসিংহ তাঁদিকে সেনাপতি ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পদ দেন। কিছুকাল পরে পাঠান ভ্রাতৃদ্বয় রাজার

(৪৭) W. W. Hunter - Statistical Account of Bengal (Birbhum), Page 382

(৪৮) H. Blochman - Contribution to the Geography and History of Bengal, Page 222

প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। একদিন রাজা যখন পূজায় বসে আছেন, পাঠান ভ্রাতৃদ্বয় তখন তাঁকে পিছন হতে আক্রমণ করেন। ফলে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। এই সুযোগে জোনাদ খাঁ রাজা এবং তাঁর ভাই আসাদুল্লা খাঁ, উভয়কেই ধাক্কা দিয়ে নিকটস্থ একটি কুয়োতে ফেলে দেন। সেখানে দুজনেরই মৃত্যু হয়।" [৪৯] রাণীমা নামমাত্র সিংহাসনে রইলেন, বীরভূমের আসল রাজা হলেন জোনাদ খাঁ।

জোনাদ খাঁ বীরভূমের রাজা হওয়ার পর পূর্বতন রাজা বীরসিংহের বিশ্বস্ত সৈন্যদের এক বৃহৎ অংশ জোনাদ খাঁর বিরুদ্ধে রাজধানী রাজনগরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নূতন রাজা তাঁর নিজস্ব সৈন্যবলের সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত করতে সমর্থ হন এবং নিজের রাজপদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জোনাদ খাঁয়ের বীরভূমের সিংহাসন প্রাপ্তি ও নিষ্কণ্টক সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে রাজনগরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য নান্‌কার রাজ্যের রাজা বাজবসন্ত নগরের রাজার কিছু অরক্ষিত অংশ জয় করে নান্‌কারভুক্ত করে নেন। ঠিক এমনি সময় মল্লারপুরের রাজা মল্লারসিং আত্মহত্যা করলেন। মল্লারসিং এর আত্মহত্যার কারণও ছিল অদ্ভুত। ঐ ঘটনা সম্বন্ধে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন — "14 miles from Suri, there is a village called Mollarpur. Mollar Singh was its proprietor a religious and popular man. He was imposed upon by a person, who told him that the Raja of Nagor intended to make him adopt the religion of Mohammad. This he took so much to heart that without enquiry as to its truth, he put himself to death. The Raja was grieved on hearing of his death and endeavoured to discover the pepetrator of the trick but without success." [৫০] মল্লারসিং কোনও লোকের কাছে শুনেছিলেন যে নগরের রাজা তাঁকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে চান। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং নগরের রাজার

(৪৯) ***Final Report on the Survey & Settlement operation in the District of Birbhum 1924 - 32, Page 10-11***

(৫০) ***W. W. Hunter — Statistical Account of Bengal (Birbhum), Page 291***

দ্বারা ধর্মান্তর করার ব্যাপারটার কোনরূপ অনুসন্ধান না করেই আত্মহত্যা করেন। মল্লারসিং জনপ্রিয় এবং ধার্মিক রাজা ছিলেন। জোনাদ খাঁ তাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং কে এই কৌশল প্রয়োগ করেছে তার অনুসন্ধানও করেন কিন্তু কৌশল প্রয়োগকারীকে চিহ্নিত করতে পারেন নাই।

নগরের মুসলমান রাজা, মল্লারসিং এর মৃত্যুতে দুঃখিত হলেও মলুটী নান্‌কারের রাজা বাজবসন্ত, যিনি ডামরায় বাস করছিলেন, সুযোগটুকু পুরোপুরি গ্রহণ করলেন। অযথা সময় ব্যয় না করে তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মল্লারপুর তালুক নিজের অধীনে আনার জন্য। অনতিবিলম্বে মল্লারপুর তালুকটি রাজা বাজবসন্তর করায়ত্ত হল। এই তালুকে জমির পরিমাণ ছিল তিরিশ হাজার চারশো দশ একর। "The final settlement report of the Mollarpur Estate of 1893-94 observes that the village derives its name from Mollar Singh who was its original proprietor. It was a permanently settled estate and according to the Revenue Survey of 1851 it consisted 30,410 acres of land. The fiscal history of the estate says that after the death of Mollar Singh it fell into the hand of Raja Baj Basanto of Maluti who lived in Damra." [৫১]

রাজা জোনাদ খাঁ দ্বারা রাজনগরে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয় আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এর দু-চার বছরের ভিতরেই মল্লারপুর নান্‌কারভুক্ত হয়। এই হিসাবে ১৫৬৫ হতে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২৫ বছর মল্লারপুর তালুক নান্‌কারের অধীনে ছিল। রাজা বাজবসন্ত হতে অধস্তন ষষ্ঠ রাজা, রাজচন্দ্রের সঙ্গে নগরের রাজা খাজা কামাল খানের (১৬৫৯-১৬৯৭) ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ডামরার ময়দানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে নান্‌কারের রাজা রাজচন্দ্র নিহত হন এবং মল্লারপুর তালুকসহ সমগ্র অঞ্চল নগরের রাজার অধিকারে চলে যায়। বীরভূম গেজেটীয়ার্সের পূর্ববর্তী রিপোর্টের শেষ অংশে তার উল্লেখ করা

(৫১) ***Durgadas Majumder - West Bengal District Gazetteers, Birbhum, 1975, Page 571***

হয়েছে এইভাবে — **"A Pathan Raja of Nagor invaded the estate, killed its king and took in his possession the whole tract with unlimited sway".** [৫২]

রাজা বাজবসন্তর রাজত্বকালের শেষদিকে নান্‌কার তালুকের ছিল চরম উন্নতির সময়। সেই সময় রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় ছত্রিশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি বৃত্তাকার ভূখণ্ড। রাজ্যের চতুঃসীমায় দেখা যায় পূর্বে দ্বারকা নদী, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা বিভাগের দুমকা জেলার অনেকটা ভিতরে অবস্থিত চিরুডি বা কাড়াকাটা গ্রাম, উত্তরে বালিয়া-মৃত্যুঞ্জয়পুর এবং দক্ষিণে মল্লারপুর সহ ডামরার দক্ষিণে সম্পূর্ণ জঙ্গল অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের জন্য কোন কর দিতে হত না। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন প্রচলিত ভূমিকরের পরিবর্তন শুরু করেন, সেই সময় মলুটী নান্‌কার তালুকের উপর অতি সামান্য নামমাত্র কিছু টাকা খাজনা ধার্য্য করা হয়। সেই সময় নানকার তালুকের আয় ছিল লক্ষাধিক টাকা। সামান্য খাজনা বাদে বাকি বিরাট উদ্বৃত্ত অর্থ এখানকার রাজারা ব্যয় করেছেন দেবালয় স্থাপনে, পূজা-অর্চনায় এবং জ্ঞানী-গুণী সম্বর্ধনায়। যার ফলে বহু দূর-দূরান্তর পর্যন্ত আজও মলুটীর রাজারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তী সময়ে একান্নবর্তী রাজপরিবারে বিঘটন হয়ে পরিবার পিছু জমিদারী আয় তুলনামূলক ভাবে কমে গেলেও জমিদারী বিলোপ পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের বাৎসরিক সম্বর্ধনা ও বৃত্তিদান ব্যবস্থা নিয়মিত চালানো হয়েছে। জমিদারী চলে যাওয়ার পরেও সাধু-সন্তদের সম্মানরক্ষা ও দেব-দেবী পূজার আড়ম্বরও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। নান্‌কার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বাজবসন্ত রাজ্যলাভ করেছিলেন মাত্র ১০-১১ বৎসর বয়সে, ফলে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি রাজত্ব করেছেন। বীরভূমের সেই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির অরক্ষিত বা স্বল্পরক্ষিত স্থানসমূহ সৈন্যবলের সাহায্যে জয় করে তিনি রাজ্যের বিস্তৃতি চরমসীমায় পৌছে দিয়েছিলেন। ইংরেজদের শাসনাধীনে আসার পূর্বে বীরভূমের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় খ্যাতনামা ভূস্বামীদের নামের তালিকায় রাজা বসন্ত রায় এবং তার অধস্তন ষষ্ঠ রাজা, রাজচন্দ্রের

(৫২) Durgadas Majumder - District Gazetteers, Birbhum, 1975, Page 571

নামের উল্লেখ রয়েছে। তালিকায় উল্লেখিত "রাজন্যবর্গের মধ্যে বানরাজা, রাজা মানপতি, রাজা জয়সিং, রাজা চন্দ্রচূড়, রাজা মল্ল, রাজা বীরসিংহ, রাজা বসন্তরায়, রাজা রাজচন্দ্র প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।" [৫৩]

রাজা রামসা

(১৫৭০-১৬০০ আনুমানিক রাজত্বকাল)

বীরভূমের রাজা

জোনাদ খাঁ (১৫৬০-১৬০০)

রাজা বাজবসন্তর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাম সহায় বা রামসা নান্‌কার রাজ্যের রাজা হন আনুমানিক ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা রামসার নাম বা তাঁর কীর্তিকলাপ জনশ্রুতি ও কাহিনীর মাধ্যম ছাড়া সরকারী রেকর্ড বা স্বীকৃত কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে জানা যায় যে, রাজা হওয়ার পর রামসা নান্‌কার রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করবার উদ্যোগ নেন। এর জন্য সৈন্যবল বাড়াতে থাকেন। সৈন্যবৃদ্ধির জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন পড়ে। অর্থের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রজা বা ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। নিজ রাজ্যের বর্ধিষ্ণু প্রজারাও অত্যাচার হতে বাদ যান নাই। অঞ্চলের অত্যাচারিত প্রজা ও ছোট জমিদারগণ রাজনগরের রাজার পরোক্ষ সমর্থনে সুলতানের কাছে রাজা রামসার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। গৌড়ের সিংহাসনে তখন রয়েছেন কররানী বংশের সুলতান দাউদ খান। তিনি সব শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে রাজা রামসাকে বন্দী করে আনার জন্য রাজা জোনাদ খাঁকে নির্দেশ দিলেন।

রাজা বাজবসন্ত কর্তৃক মল্লারপুর তালুক অধিকৃত হওয়ার পর হতেই রাজনগরের রাজার বিষদৃষ্টিতে ছিলেন নান্‌কারের রাজা। সম্ভবতঃ রাজা জোনাদ খাঁ ধারণা করেছিলেন যে, রাজা মল্লারসিং এর আত্মহত্যা করানোর কৌশলটি নান্‌কারের রাজার দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল । তাই

(৫৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' বীরভূম সংখ্যা - পৃঃ ৩৫৭

সুলতানের নির্দেশে উল্লসিত হয়ে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে রামসার রাজধানী ডামরা আক্রমণ করলেন কিন্তু রাজা রামসা অতি সহজেই নগরের সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। সুলতানের কাছে সংবাদ পৌছুলো। এই দুঃসংবাদ সুলতানের ক্রোধে ঘৃতাহুতি হয়ে দাঁড়ালো। সুলতান দাউদ খান রাজা রামসার ছিন্নমুণ্ড অতি শীঘ্র তাঁর দরবারে হাজির করার জন্য সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। *

নগরের রাজাকে পরাজিত করে রামসা সুলতানের দরবারে এক গুপ্তচর পাঠিয়ে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করলেন। গুপ্তচর মুখে পরিস্থিতি প্রতিকূল জেনে তিনি শেষে গুরুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁকে কাশী হতে এনে এক ফকিরের সহায়তায় ডান হতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে সুলতানকে উপহার দিয়ে তাঁর ক্রোধ হতে সে যাত্রা রক্ষা পান।

গুরুর কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে কাশী সুমেরু মঠের দণ্ডিসন্ন্যাসীর কাছে বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজা রামসা যথোচিত রাজধর্ম পালন করে গেছেন। তখন হতেই কাশীর সুমেরু মঠের দণ্ডিস্বামীকে রাজগুরু বলা হয়ে আসছে। পরবর্তী সময়ে সুমেরু মঠের মহন্ত দণ্ডিস্বামী স্বয়ংপ্রকাশানন্দ তীর্থ (১৭৫৭-১৭৭৫) কাশীরাজ মহীপনারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দিয়ে রাজগুরুপদ সুদৃঢ় করেন। [৫৪]

দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ লিখেছেন রাজা রামসা গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাশীধামে "শ্রীগুরুর মঠে অবস্থান পূর্বক পার্শ্বে জমি খরিদ করিয়া বাটী নির্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবত্র করতঃ শ্রীগুরুকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন"। [৫৫] তিনি আরও লিখেছেন যে, "পরবর্তী মহন্ত বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থ দণ্ডিস্বামী উন্মত্ত অবস্থায় জনৈক পরেশ কবিরাজকে ঐ সম্পত্তি সিকিমূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন"। ফলে কাশীধামে নান্‌কারের

** মুসলমান শাসনকালে বিদ্রোহী রাজা, সেনাপতি বা সেনাদের শাস্তি মুণ্ডচ্ছেদন ছিল অতি পরিচিত নিয়ম। "শত্রুর মস্তক কাটিয়া উপহার প্রেরণ মোগল পক্ষের নিয়ম" — আকবর নামা (ইংরাজী অনুবাদ)*

(৫৪) শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী — রাজগুরু সুমেরু মঠস্য মঠাম্নায়ঃ, পৃঃ ৮

(৫৫) দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ — শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচার্য্যের আসন, পৃঃ ৩৬

রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তিগুলি সহ অন্নপূর্ণা মন্দির যা, মলুটীর রাজাদের অমূল্য কীর্তি, চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন।

রাজা রামসার মৃত্যুর পর ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর নান্‌কারের রাজাদের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ঐ সময়ে দুই জন রাজা রাজত্ব করে থাকবেন। রাজাদ্বয়ের নাম এবং তাঁদের কোন কীর্তি অথবা পুরাকীর্তির পরিচয় না পাওয়ায় নান্‌কার রাজ্যের ঐ পঞ্চাশ বছরের সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। তবে এই রাজা দুজন ডামরাতেই যে বাস করেছিলেন সেটা নিশ্চিত। কেননা তাঁদের পূর্বপুরুষ রাজা বসন্ত ও রাজা রামসার রাজধানী ছিল ডামরা এবং পরবর্তী পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজারও রাজধানী ছিল ডামরা। সেখান হতেই তাঁরা নান্‌কার রাজ্য শাসন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে মধ্যেকার দুইজন রাজাও যে ঐ একই স্থানকে রাজধানী করে রাখবেন এটা খুব স্বাভাবিক। এই পঞ্চাশ বছর একজন বা দুজন অজ্ঞাত রাজার রাজত্বকালের কোন তথ্য বা তাঁদের নামের উল্লেখ জনশ্রুতি বা কোন দলিলের মধ্যেও পাওয়া যায় না সেইজন্য এই সময়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ অনুমানসাপেক্ষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

ডামরা গ্রামের পশ্চিমে ধমরপুর নামে একটি আদিবাসী গ্রাম রয়েছে। এটা সম্ভব হলেও হতে পারে রাজা রামসার পুত্রের নাম ধর্মরায় ছিল এবং নিজ নামের সঙ্গে তিনি ধর্মপুর (পরে ধরমপুর) নামে গ্রামটির প্রতিষ্ঠা করেন। কেননা, পরবর্তীকালে দেখা গেছে নান্‌কারের রাজারা নিজের নাম যুক্ত করে প্রতাপপুর, দেবদত্তপুর, চণ্ডীপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই নামের ব্যাপারে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হচ্ছে - ডামরা ও ধরমপুর গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গায় অল্প ব্যবধানের মধ্যে দুটি পাথর পোঁতা আছে এবং সিঁদুরলিপ্ত ঐ পাথর দুটিকে চণ্ডীঠাকুর রূপে পূজা করা হয়। চণ্ডীর নাম ডামরায় চণ্ডী (ডামরা চণ্ডী নয়) ও বাঘরায় চণ্ডী। চণ্ডীঠাকুরের এই ধরনের নাম হতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন বিশিষ্ট লোকের নামকে স্থায়ী করার জন্য স্থানীয় সর্বশ্রেণীর লোকেদের পূজ্য এক লৌকিক দেবতার নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ডামরায় চণ্ডীর পূর্বনাম সম্ভবতঃ ধর্মরায় চণ্ডী ছিল। পাশের গ্রাম ডামরার

জনসাধারণ এই চণ্ডীঠাকুরদ্বয়ের পূজায় বৃহৎ অংশীদার সেই জন্য তিনি ডামরার চণ্ডী বলে কথিত হয়ে থাকতে পারেন। পরে ডামরা ও ধর্মরায় মিলে ডামরায় চণ্ডী নামকরণ হয়ে থাকার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। মধ্যযুগের শেষ দিকে লৌকিক দেবতার সঙ্গে নাম যুক্ত করে নিজের নামকে চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি বর্তমান প্রসঙ্গটির সম্পূর্ণ সমর্থন করে — "মুসলমান আমলে হয়তো একাধিক রায় উপাধির দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল। শুধু দক্ষিণরায় নয়, হরিরায়, বিষমরায়, কালুরায়, ইত্যাদি। এই রকম রায় উপাধিধারী অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে - হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে। এঁরা অনেকেই হয়তো আঞ্চলিক সামন্ত-রাজা, জমিদার বা যোদ্ধা ছিলেন এবং পরে গ্রাম্য লোকদেবতার মহিমা আত্মসাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন। কেউ ধর্মঠাকুর হতে হয়েছেন বাঁকুড়া রায়, কালাচাঁদ রায় ইত্যাদি। কেউ বনদেবতা ও বাঘের দেবতা হতে হয়েছেন দক্ষিণরায়"। [৫৬]

দুইভাই অথবা পিতাপুত্র ধর্মরায় এবং বাঘরায় সম্ভবতঃ নান্‌কার রাজ্যের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাজা। প্রত্যক্ষভাবে এঁদের নাম বা এঁদের দ্বারা কৃত কোন রাজকীয় কীর্তিকলাপ অজ্ঞাত থাকলেও তাঁরা যে দুর্বল শাসক ছিলেন সেরকম মনে হয় না। কেননা নান্‌কারের প্রতাপশালী রাজা, রামসার মৃত্যুর পরও নগরের রাজা মল্লারপুর তালুক দখল করতে পারেন নাই।

অবশ্য এর আর একটি কারণ থাকতে পারে। মাঝের ঐ রিক্ত পঞ্চাশ বছর সময়কালে রাজনগরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রাজা জোনাদ খাঁয়ের পুত্র রণমস্ত খাঁ, অপর নাম বাহাদুর খাঁ। "তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস হতে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা কর্তিক পর্যন্ত দীর্ঘ একটানা ঊনষাট বছর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করেন"। [৫৭] "রাজনগরের ইতিহাসে বীরভূমের মুসলমান রাজাদের মধ্যে এই রাজা সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ১৫৬৫ শকাব্দে অর্থাৎ

(৫৬) বিনয় ঘোষ — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৯২

*(৫৭) **W. W. Hunter — Statistical Account of Bengal (Birbhum), Page 393***

১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিলাসপুরে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দিরের এক লিপিতে উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যায়"। [৫৮] এই দিক দিয়ে বিচার করে বোঝা যায় রাজনগরে রাজা রণমস্ত খাঁর শাসনকালে পাশাপাশি উভয় রাজ্য, নান্‌কার ও নগর রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনও রকম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়ে শান্তিতে কালাতিপাত করেছে।

১৬০০ হতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নান্‌কার রাজ্যের অজ্ঞাত রাজাদ্বয়ের রাজত্বকালের মধ্যে অন্ততঃ একটি পরোক্ষ নিদর্শন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে পূর্ব রাজধানী ডামরা ও পরবর্তী রাজধানী মলুটীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মাসড়া গ্রামে একটি ছোট শিব মন্দির আছে। মন্দিরটির অলঙ্করণ ফুল পাথরে খোদাই করা। মন্দিরের লিপি উদ্ধার করে দেখা যায় রাজলোহাপাল সিতবদাসের মাতা সম্ভবতঃ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে। [৫৯] এই অঞ্চল তখন 'লোহামহল' নামে বিদেশী ব্যবসায়ীদের ইজারার মধ্যে আসে নাই। সেইজন্য রাজধানী সংলগ্ন নান্‌কারভুক্ত মাসড়া গ্রাম নিবাসী রাজলোহাপাল (শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ রাজকীয় ইঞ্জিনীয়ার) সিতবদাস কর্মকার সমসাময়িক নান্‌কারের রাজাদ্বয়ের মধ্যে কোন একজনের রাজত্বকালে তিনি মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। উচ্চপদস্থ ও বর্দ্ধিষ্ণু হওয়ার জন্য সিতবদাস মায়ের নামে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

*(৫৮) **Dr. Dinesh Chandra Sen — Inscription from Kabilaspur temple, Saks - 1565.***

(৫৯) সম্পূর্ণ লিপিটি এইরূপ — শ্রীশ্রী রামাই ১৫৫৩ সেবক রাজ লোহাপাল। ৪২৩ XXX সিতবদাস কর্মকারের মাতা শ্রীমতী সিদ্ধর শ্রীশ্রীঈশ্বর শিব স্থাপনকারি XXX XXX

রাজা জয়চন্দ্র
(১৬৫০-১৬৮০ আনুমানিক রাজত্বকাল)

বীরভূমের রাজা
রণমস্ত খাঁ (১৬০০-১৬৫৯)
খাজা কামাল খাঁ (১৬৫৯-১৬৯৭)

নান্‌কার রাজ্যের পঞ্চম রাজা জয়চন্দ্র। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি ছাড়া নান্‌কারের পূর্ব রাজধানী ডামরা গ্রামে তাঁর রাজকীর্তির কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। সেই কালে স্নান, মৎস্যপালন বা কৃষির জন্য ডামরা গ্রামে যে কয়টি বৃহৎ জলাশয় খনন করানো হয়েছিল তার মধ্যে অন্ততঃ একটি পুষ্করিণী রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত। সেই দীঘির নাম জয়সাগর। এছাড়া আছে দরজা দীঘি ও থুনিপোঁতা দীঘি। স্থানীয় লোকেরা আজও বলেন, ঐ বৃহৎ পুষ্করিণীগুলি রাজা জয়চন্দ্রেরই অবদান। রাজবাড়ির বিরাট ধ্বংসস্তূপের পাশেই দরজা দীঘি। জলাভূমি পঞ্চাশ বিঘার উপর। পুষ্করিণীর নাম শুনে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, রাজবাড়ির দরজার কছেই দীঘিটির অবস্থান ছিল। রয়েছে থুনিপোঁতা দীঘি। 'থুনি' বীরভূমের চলতি গ্রাম্য শব্দ। এর অর্থ মাচান। থুনিপোঁতা নাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, পুষ্করিণীর মধ্যস্থলের তলদেশে চারটি খুঁটি পোঁতা ছিল। ঐগুলির গোড়া অংশ চুন-সুরকির গাঁথনি দিয়ে খুব শক্ত করে আটকানো। জলের অনেকটা উপরে ঐ চারটি খুঁটির মাথায় মাচান বাঁধা থাকত। রাজা ঐ দীঘিতে নৌকাবিহার করতেন এবং মাচানে বসে সান্ধ্যকালীন হাওয়া খেতেন।

আশ্চর্যের বিষয় খুঁটিগুলির বয়স তিনশো বছরের উপর হলেও তিন দশক আগে এক গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল কমে যাওয়ার পর একটি খুঁটির সামান্য অংশ তখনও দেখা যাচ্ছিল। পচে যাওয়া খুঁটিটির রং ছিল ঘোর কালো। বাকি তিনটি খুঁটির অস্তিত্ব ছিল না।

নান্‌কারের রাজাদের দ্বারা কেবল যে রাজধানী ডামরা গ্রামেই পুষ্করিণী খনন করানোর ব্যপকতা ছিল তেমন নয়, রাজা জয়চন্দ্র বা তাঁর পুত্র রাজচন্দ্রের মধ্যে কেউ একজন মল্লেশ্বর শিবের দর্শন ও পূজার জন্য আসা ভক্ত-যাত্রীদের সুবিধার্থে সেখানেও একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন।

মল্লারপুরে অবস্থিত মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে যে পুস্করিণীটি নান্‌কারের রাজা খনন করিয়ে দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে শিবলীলা কবিতা পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে এইরকম —

"গ্রীষ্মাবাস সরোবর অনিল সেবনে।
থুনিপোতা অদ্যাপিও আছে বিদ্যমানে।।
সেই বংশ পরবর্তী এক নৃপবর।
জয়চন্দ্র কীর্তি জয়সাগর সুন্দর।
তার পরবর্তী বেণীচন্দ্র মহিপাল।
খোদি দিলা মল্লেশ্বর দীর্ঘিকা বিশাল।" [৬০]

শিবলীলা পুস্তকে কথিত বেণীচন্দ্র মহীপাল, নান্‌কারের রাজা, জয়চন্দ্রের পুত্র রাজা রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র ছিলেন রাজা রাখড়চন্দ্র। মলুটীর এক মন্দিরে রাজা রাখড়চন্দ্রের পিতার নাম রাজচাঁদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নান্‌কারের রাজা পরাজিত ও নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত মল্লারপুর তালুক নান্‌কারভুক্ত ছিল। সেইজন্য খুবই স্বাভাবিক নান্‌কারের ধর্মপ্রাণ রাজা রাজচন্দ্র মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করিয়ে দেন।

রাজা জয়চন্দ্রের শাসনকাল নিরুপদ্রবেই কেটেছিল বলে মনে হয়। কেননা, তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে নগরের রাজা ছিলেন রণমস্ত খাঁ, যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে প্রজাদের কল্যাণ চিন্তা করতেন। "তাঁর রাজত্বকালে দেশের লোকের অন্নকষ্ট ছিল না"। [৬১] শেষের দিকে তাঁর উচ্চাকাঙ্খী পুত্র খাজা কামাল খাঁ নগরের সিংহাসনে বসলেও মোগলদের গৃহযুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েক বছর চুপচাপ থাকতে বাধ্য হন।

রাজা জয়চন্দ্র পর্যন্ত নান্‌কার রাজ্যে বরাবর একক রাজাই রাজত্ব করে চলেছিলেন কিন্তু রাজা জয়চন্দ্রের মৃত্যুর সময় তার তিন পুত্র বর্তমান ছিলেন। এঁদের নাম যথাক্রমে রাজচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহাদেবচন্দ্র। মলুটী নান্‌কার তালুকের পুরাতন নথিপত্র হতে জানা যায়, রাজা জয়চন্দ্র মৃত্যুর

---

(৬০) কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — শিবলীলা, পৃঃ ২১
(৬১) পশ্চিমবঙ্গ - বীরভূম সংখ্যা — ২০০৬, পৃঃ ৩৫৫

পূর্বে তাঁর সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্ধেক অংশ জ্যেষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রকে দিয়ে যান এবং 'রাজা' উপাধিও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রাপ্য হয়। বাকি অর্ধেক রাজ্য অন্য দুই পুত্রকে সমান ভাগে ভাগ করে দেন। পিতা সম্পত্তি ভাগ করে দিলেও, তিন ভাই ডামরা রাজবাড়িতে যথেষ্ট সম্প্রীতির সঙ্গে একত্রে বাস করতেন। তিন ভায়ের মধ্যে রাজচন্দ্র জ্যেষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তিনি নান্‌কার রাজ্যের পরবর্তী রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

রাজা রাজচন্দ্র

(১৬৮০-১৬৯০ আনুমানিক রাজত্বকাল)

বীরভূমের রাজা

খাজা কামাল খাঁ (১৬৫৯-১৬৯৭)

রাজা রাজচন্দ্র অল্প কয়েক বৎসরের জন্যই নান্‌কার রাজ্যের রাজা হতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতামহদের সময় নান্‌কার রাজ্যে যে শান্তির পরিবেশ ছিল তাঁর সময়ে সেই শান্তি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। এর মূল কারণ ছিল রাজা বাজবসন্ত দ্বারা মল্লারপুর তালুক অধিকারের প্রশ্নে রাজনগরের রাজাদের প্রতিশোধ আকাঙখা সেই তখন হতেই অন্তঃসলিলা নদীর জলের মত বহমান ছিল। নগরের নূতন রাজা, কামাল খাঁয়ের সিংহাসন আরোহণের পর সেই প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

রাজা রণমস্ত খাঁ (বাহাদুর খাঁ) এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খাজা কামাল খাঁ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের রাজা হন। উচ্চাকাঙ্খী কামাল খাঁ রাজতক্তে বসার পরই পার্শ্ববর্তী ছোট জমিদারদের উচ্ছেদ করে তাঁদের ভূসম্পত্তি নিজ রাজ্যভূক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন। "তবে রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর মুঘলদের গৃহ বিবাদের সুযোগে তিনি শাহজাহানের পুত্র সুজার পক্ষ অবলম্বন করেন। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী সুজাকে অনুসরণ করে পাটনায় এলে, শাহজাদা সুজা বীরভূমের আফগান জমিদার খাজা কামালের সহায়তায় সিউড়ি হয়ে জঙ্গল তরায়ে পালাবার সুযোগ পান।" [৬২] "খাজা কামাল খাঁ, সুজাকে বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গল হয়ে ২৮শে মার্চ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন "। [৬৩] ফলে তাঁর উপর ঔরঙ্গজেবের কোপ দৃষ্টি পড়ে যায়। ঐরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বীরভূমের রাজা বাধ্য হয়ে বেশ কয়েক বৎসর চুপ করে থাকেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজা কামাল খাঁ পার্শ্ববর্তী নান্‌কার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দেন। মাঝে দু-একটি ছোট যুদ্ধ হলেও বীরভূমের রাজা নান্‌কারের রাজা, রাজচন্দ্রকে পর্য্যুদস্ত করতে পারেন নাই। কিম্বদন্তী আছে যে, ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রাজভ্রাতা রামচন্দ্র ও মহাদেবচন্দ্র বেশ কিছু সৈন্য-সামন্তসহ পরিবারের লোকজন নিয়ে গুরু এবং তীর্থ দর্শনের জন্য কাশীর পথে রওনা হন। রাজধানী ডামরাতে রাজা রাজচন্দ্র, তাঁর পরিবার ও সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ রয়ে যায়। পূর্ববর্তী দল ফিরে এলে রাজা বাকি লোকদের নিয়ে কাশী যাবেন স্থির হয়েছিল। রাজা কামাল খাঁ সুযোগ বুঝে ঐ সময় নান্‌কার রাজ্যের রাজধানী ডামরা আক্রমণ করেন। রাজচন্দ্র অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন কিন্তু বীরভূমের রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দুই তিন দিনের যুদ্ধেই নান্‌কারের রাজাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। ডামরার অদূরবর্তী স্থানে যেখানে রাজচন্দ্রকে হত্যা করা হয়েছিল বর্তমানে সেই জায়গাটিতে একটি ডোবা আছে এবং সেই ডোবার নাম রাজাকাটা। রাজপরিবারের বাকি লোকেরা যুদ্ধ চলাকালেই পরাজয়ের আশঙ্কায় নিরপত্তার জন্য রাজধানী হতে প্রায় বারো কিলোমিটার উত্তরে ভাটিনা নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আশ্রয় নেন। অরক্ষিত রাজধানী, অবাধ লুটপাট এবং অগ্নির শিকার হয়। রাজবাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়।

দুঃসংবাদ পৌঁছুল কাশীতে। সৈন্য-সামন্তসহ দুই ভাই তীর্থদর্শন অসমাপ্ত রেখে রাজধানীতে দ্রুত ফিরে এলেন। সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের পর স্থায়ী রাজধানী ডামরা ত্যাগ করে ভাটিনার জঙ্গলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ঐখান হতেই সৈন্য-সামন্ত নূতন করে সাজিয়ে বীরভূমের রাজাকে আক্রমণ শুরু করলেন। মাঝে বেশ কিছু সময় যুদ্ধ চলতে লাগল। নান্‌কারের রাজাগণ ক্রমে তাঁদের হৃতরাজ্যের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করে ফেললেন । কেবলমাত্র তাঁদের পূর্বপুরুষের

(৬২) ***Durgadas Majumdar - West Bengal District Gazetteers (Birbhum) 1975, Page 105***

(৬৩) ***P. C. Roy Chowdhury - Santal Pargana Gazetteers, Page 54***

বিজিত মল্লারপুর তালুকটির সঙ্গে নানকার রাজ্যের রাজধানী ডামরাও চিরকালের জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। "পরবর্তীকালে বীরভূমের রাজাদের বংশধর আসাদ জমান খান, কলকাতার এক কেষ্টোরাম বোসকে মল্লারপুর তালুকটি বিক্রি করেন। বাবু কেষ্টোরাম আবার বর্দ্ধমানের মহারাজাকে হাতবদল করেন। মহারাজা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেত্রকুমারী ও উমাসুন্দরী দাসীকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকায় তালুকটি পত্তনী দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোহান্ত গোপালদাস ঐ তালুকটি কিনে নেন এবং জমিদারী বিলোপ পর্যন্ত শিষ্য পরম্পরায় মোহান্তের সম্পত্তি হয়ে থাকে।" [৬৪]

ডামরা যুদ্ধের প্রসঙ্গে নানকার রাজাদের সম্পর্কে লেখা একটি স্থানীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাজনগরের রাজা আলিনকি খাঁ রাজা রাজচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তথ্যটি একেবারেই ইতিহাস সম্মত

রাজধানী ডামরায়
নানকারের রাজাদের বংশপঞ্জী

রাজা বাজবসন্ত (১৫২০-১৫৭০)
|
রাজা রামসা (১৫৭০-১৬০০)
|
রাজা ধর্মরায় ? } (১৬০০-১৬৫০)
|
রাজা বাঘ রায় ?
|
রাজা জয়চন্দ্র (১৬৫০-১৬৮০)
|
রাজা রাজচন্দ্র (১৬৮০-১৬৯০)   রামচন্দ্র   মহাদেবচন্দ্র

(নানকারের পরবর্তী রাজারা মলুটী গ্রামে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।)

(৬৪) Durgadas Majumdar - West Bengal District Gazetteers (Birbhum) 1975, Page 571-572

নয়। রাজনগরের দেওয়ান আলিনকি খাঁ (?-১৭৬৪) রাজা রাজচন্দ্রের পৌত্র রাজা আনন্দচন্দ্রের (১৭৩৫-১৭৮০) সমসাময়িক। রাজচন্দ্রের পুত্র রাজা রাখড়চন্দ্রের নির্মাণ করানো মলুটীর মৌলীক্ষা মন্দিরের সামনের শিবমন্দিরটির তারিখ ১৬৪১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা রাজচন্দ্র নিহত হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র ও মহাদেবচন্দ্রের সঙ্গে পুত্র রাখড়চন্দ্র মলুটী এসেছিলেন। মন্দির নির্মাণের সময় থেকে অন্ততঃ ২০-২৫ বছর আগে তাঁরা মলুটী এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছেন। সেই হিসাবে ডামরা যুদ্ধ ১৭০০ খ্রীষ্টব্দের কিছু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আলিনকি খাঁ যে রাজা আনন্দচন্দ্রের সমসাময়িক সেটি গবেষক শিবরতন মিত্রের লেখা হতে আরও পরিস্ফুট হয়। "রাজা আনন্দচন্দ্র যে দাবা খেলায় সিদ্ধহস্ত ও সভাসদ কবি 'গোয়েবী গঙ্গানারায়ণকে' * বীরভূম রাজনগরের ইতিহাস বিখ্যাত আলিনকি খাঁর নিকট দাবা খেলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, একথা আবহমানকাল প্রচলিত আছে। দেওয়ান আলিনকি খাঁ ১৭৬৪ খ্রীঃ ২রা মার্চ, বঙ্গাব্দ ১১৭০ ২১শে ফাল্গুন, নূন্যাধিক দুই বৎসরকাল শয্যাগত রহিয়া দেহত্যাগ করেন।" [৬৫]

নানকারের রাজাদের সমসাময়িক
রাজনগরের রাজাগণ

রাজা জোনাদ খাঁ (১৫৬০-১৬০০)
(রাজা বীরসিংহ এবং নিজের ভাই আসাদুল্লা খাঁকে হত্যা করে আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের রাজা হন। রাজধানী হয় রাজনগর)
|
রাজা রণমস্ত খাঁ (বাহাদুর খাঁ) (১৬০০-১৬৫৯)
|
রাজা খাজা কামাল খাঁ (১৬৫৯-১৬৯৭)
(রাজা কামাল খাঁয়ের সঙ্গে নানকারের রাজা রাজচন্দ্রের ডামরাতে যুদ্ধ হয়)
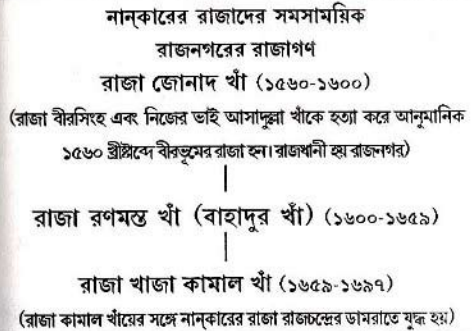
* *গোয়েবী - দাবা খেলায় পারদর্শী।*

(৬৫) শিবরতন মিত্র - প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮৮

দেওয়ান আলিনকি মারা যান ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। জন্ম ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে হওয়ায় সম্ভব। কারণ, তিনি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার সেনাপতি ছিলেন। নবাব সিরাজদৌল্লার বাধা সত্বেও ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করতে থাকে। তখনই আলিনকি নবাবের সেনাপতিরূপে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তখন তাঁর বয়স নিশ্চয় পঞ্চাশের মধ্যেই থাকবে। সেক্ষেত্রে ডামরা যুদ্ধের সময় সম্ভবতঃ আলিনকির জন্মই হয় নাই। কলকাতার যুদ্ধ প্রসঙ্গে

রাজধানী মলুটীতে রাজা উপাধিধারী নান্‌কারের রাজাদের বংশপঞ্জী

রাজা রাখড়চন্দ্র (১৬৯৫-১৭৩৫)
(পিতা রাজা রাজচন্দ্র)
|
রাজা আনন্দচন্দ্র (১৭৩৫-১৭৮০)
|
রাজা জগচ্চন্দ্র (১৭৮০-১৮১০)
|
রাজা মোহনচন্দ্র (১৮১০-১৮৪০)
|
রাজা ঈশানচন্দ্র (১৮৪০-১৮৭০)
|
রাজা মেহেরচন্দ্র (১৮৭০-১৯০০)

(রাজা মেহেরচন্দ্রের পর মলুটীর রাজারা 'রাজা' উপাধি ত্যাগ করেন এবং তখন হতে মলুটীর রাজপরিবারের ব্যক্তিদের 'বাবু' বলা হয়ে আসছে)

মলুটীর মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি, সরকারী রেকর্ড, স্বীকৃত পুস্তক ও সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব বা ঐতিহাসিক ঘটনা পর্য্যালোচনার পর আনুমানিকভাবে নান্‌কারের রাজাদের রাজত্বকাল স্থির করা হয়েছে।

আলিনকির বীরত্ব সম্বন্ধে একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ বাক্যটি এইরূপ —

"আলিনকি বাহাদুর পাগড়ী মে বাঁধে তলোয়ার
এক ঘড়ি মে লুট লিয়া কলকাত্তা বাজার।"[৬৬]

বীরত্বের প্রতীক হিসেবে আলিনকি নিজের নাম অনুসারে কলকাতার পাশে আলিপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলিনকি রাজনগরের রাজা হন নাই। তাঁর সৎভাই আসাদ জমা খাঁ রাজনগরের রাজা হয়েছিলেন। আলিনকি মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বীরত্বের জন্য রাজনগরের তথা বীরভূমের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বল তারকা হয়ে আছেন। রাজনগরের রাজা বললেই দেওয়ান আলিনকির নাম এসে যায়। সেই ভাবেই ঐ স্থানীয় ইতিহাসে বোধহয় তাঁর নাম এসে গেছে।

নান্‌কারের রাজাদের সমসাময়িক রাজনগরের রাজাগণ

রাজা আসাদুল্লা খাঁ (১৬৯৭-১৭১৮)
(পিতা খাজা কামাল খাঁ)
|
রাজা বদি উল জমা খাঁ (১৭১৮-১৭৫২)

রাজা আসাদ উল জমা খাঁ (১৭৫২-১৭৭৭)	আলিনকি খাঁ (মৃত্যু ১৭৬৪)	রাজা বাহাদুর উল জমা খাঁ (১৭৭৮-১৭৮৯)

রাজা মহম্মদ জমা খাঁ
(১৭৮৯-১৮০১)

রাজা দাওরা উল জমা খাঁ
(১৮০১-১৮১২)

রাজা জোহরুল জমা খাঁ[৬৭]
(১৮১২-১৮৫৬)

রাজা জোহরুল জমা খাঁ এর পর তাঁর বংশধরেরা ছোট জমিদারে পরিণত হন।

---

(৬৬) *Final Report on the Survey and Settlement operation in the District of Birbhum 1924-32, Page 10-11*

(৬৭) *Ibid*

মলুটীতে নান্‌কারের রাজাগণ
(বাদশাহী আমল)

ডামরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নান্‌কারের রাজারা প্রথমেই মলুটীতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না। মলুটী গ্রামে বসতি স্থাপন করার আগে অন্ততঃ দুটি জায়গায় যথাক্রমে ভাটিনা ও সেনবাঁধায় তাঁরা অল্প সময়ের জন্য বসবাস করেছেন। এর কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়।[৬৮] ডামরা যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ঐ সব জায়গা হতে রাজনগরের রাজার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যুদ্ধযাত্রা সম্ভবতঃ সহজ হয়েছিল। হৃতরাজ্য কিছুটা উদ্ধার করার পর নান্‌কারের রাজারা তাঁদের যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মলুটী গ্রামকে স্থায়ী বাসস্থানের উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করেন। শুরু হয় বন কেটে বসতি স্থাপন। বিভিন্ন কর্মের জন্য বাইরে হতে নানাশ্রেণীর লোকেদের আগমন ঘটল নান্‌কারের নূতন রাজধানী মলুটী গ্রামে। এখন হতে তিনশো বছরের কিছু আগে ১৬২০ শকাব্দের (১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের) কাছাকাছি এই গ্রামের পূর্ণাঙ্গিক পত্তন হয়। এখানে আসার পর রাজারা আর যৌথপরিবারে থাকলেন না। রাজা জয়চন্দ্রের তিন পুত্র তিন অংশ হয়ে গেলেন। ডামরা যুদ্ধে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল। তাই প্রথা অনুযায়ী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখড়চন্দ্র রাজা উপাধি পেলেন এবং সম্পত্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ রাজচন্দ্রের পুত্রদের অংশে গেল। রাজচন্দ্রের আর দুই ভাই রামচন্দ্র ও মহাদেবচন্দ্র প্রত্যেকে সিকি অংশ নিয়ে আলাদা ভাবে বাসস্থান তৈরী করিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এই ভাবে মলুটীতে বাজবসন্তর বংশধরা প্রথমে তিনটি 'তরফে' ভাগ

---

(৬৮) মলুটীর রাজাদের কুলদেবী সিংহবাহিনী। তাঁরা যেখানেই বাস করেছেন সেখানেই সিংহবাহিনী দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করেছেন। সে সময় মূর্তি তৈরী করিয়ে তাঁরা পূজা করতেন কিনা জানা যায়না তবে সিংহবাহিনীর 'থান' অর্থাৎ বেদী সেখানে রয়ে গেছে এবং এখনও নিয়মিত বাৎসরিক পূজা প্রচলিত আছে। ভাটিনা ও সেনবাঁধায় ঐরকম দুটি থানে বহুপূর্ব হতে মলুটীর রাজাদের তরফ থেকে দেবী সিংহবাহিনীর পূজার ব্যবস্থা ছিল। তবে জমিদারী বিলোপের পর ভাটিনায় স্থানীয় আদিবাসী জনগণ সিংহবাহিনীর স্থানে মন্দির তৈরী করিয়ে পূজা চালাচ্ছে এবং সেনবাঁধায় রাজাদের সিংহবাহিনী পূজো ঐ গ্রামের লোকেরাই ধরে রেখেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মলুটীর রাজাদের নাম সংকল্প করে সেনবাঁধার সিংহবাহিনী থানে পূজো হত।

হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের বংশাবলী 'রাজার তরফ' নামে পরিচিত হয়। কেননা এই তরফের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করার অধিকারী ছিলেন। রাজা জয়চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্রের বংশধরগণ 'সিকির তরফ' বলে পরিচিত। এঁরা নান্‌কারের সিকি সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। জয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মহাদেবচন্দ্রও সম্পত্তির সিকি অংশ পান। ফলে প্রথম দিকে এই তরফকে 'দ্বিতীয় সিকি' বলা হত। পরে মহাদেবচন্দ্রের পুত্র সভাসদচন্দ্রের ছয়টি পুত্রসন্তান হওয়ায় দ্বিতীয় সিকি নাম পরিবর্তন করে 'ছয় তরফ' রাখা হয়। আরও পরে রাজচন্দ্রের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীচন্দ্র বড়ভাই রাজা রাখড়চন্দ্র হতে আলাদা হয়ে যান এবং পরে তাঁর বংশধারাকে 'মধ্যম বাড়ি' বলা হয়। শেষ পর্য্যন্ত মলুটীতে নান্‌কারের রাজপরিবার রাজা, মধ্যম, সিকি ও ছয় তরফ এই চার তরফে বিভক্ত হয়ে যায়। এই চার বাড়িকে মিলিয়ে 'চৌ-তরফী' বলা হয়ে আসছে।

মলুটীতে রাজধানী স্থাপন করার পর রাজা রাখড়চন্দ্র হতে রাজা মেহেরচন্দ্র পর্য্যন্ত ছয় পুরুষ মলুটীর 'রাজা' উপাধিধারী জমিদার। এর পরের জমিদারগণ রাজা উপাধি ত্যাগ করে দেন।

নান্‌কারের রাজারা মলুটীতে বাস করার পর সংখ্যাধিক পরিমাণে দেব মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন অথচ একটিও রাজবাড়ি তৈরী করান নি, তার কারণ সম্বন্ধে সম্ভাব্য যুক্তি হতে পারে যে, মলুটীকে রাজধানী করার আগে নান্‌কারের রাজপরিবার বেশ কিছু সময় বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। মলুটী গ্রামের পত্তনের পর তাঁরা কৌশলগত দিক চিন্তা করে অবিলম্বে পাকাপোক্ত রাজবাড়ি তৈরী করানোর ইচ্ছা করেন নি। হয়তো অনেক বছর এই গ্রামটিকেও অস্থায়ী বাসস্থান বলে চিন্তা করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজপরিবারের অংশীদার বেড়ে যায়। সকলে নিজস্ব সাধারণ বাড়ি তৈরী করেই সন্তুষ্ট থাকেন। এছাড়া মলুটীতে আগমনের পর বড় তরফের রাজা রাখড়চন্দ্র, যিনি অনায়াসে একাধিক রাজবাড়ি তৈরী করাতে পারতেন, তিনি নিজেই ছিলেন নির্লিপ্ত ব্যক্তি। রাখড়চন্দ্র ছিলেন উচ্চমার্গের সাধক এবং পূর্ণযোগী। ঐ প্রভাব তাঁর বংশধর এবং সমগ্রভাবে নান্‌কার রাজপরিবারের সকল সদস্যদের উপরেও যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার করেছিল। সেইজন্য মলুটীর রাজাদের মধ্যে রাজসিকতার পরিবর্তে সাত্ত্বিকতা বেশী দেখা যায়।

রাজা রাখড়চন্দ্র (১৬৯৫-১৭৩৫)

রাজা রাখড়চন্দ্র দুই পিতৃব্যের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য যখন মলুটীতে আসেন তখন তিনি ছিলেন কিশোর বয়স্ক বালক মাত্র। কারণ রাখড়চন্দ্রের পিতা রাজা রাজচন্দ্র অল্প সময়ের জন্য রাজা হয়েছিলেন। তিনি নিজে রাজনগরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং রাজাকাটায় নিহত হন। তখন তিনি যুবাপুরুষই থাকবেন। রাজার ঐ রকম বয়সে তাঁর পুত্র রাখড়চন্দ্রের বয়সও কিশোর কালের মধ্যে থাকাটায় স্বাভাবিক। মনে হয় রাখড়চন্দ্রের বয়স কম হওয়ার জন্য কয়েক বছর তাঁকে অন্যের তত্ত্বাবধানে চলতে হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলি শুনে ধারণা হয় যে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও রাজকার্য্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। নূতন রাজধানী মলুটীতে তিনি নানকারের প্রথম রাজা। তাঁর সম্বন্ধে অন্ততঃ দুটি প্রত্যক্ষ ও একটি পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া একাধিক অলৌকিক ঘটনাযুক্ত কাহিনী প্রচলিত আছে।

প্রথমটি অবশ্য পাথরে লিখিত প্রমাণ। মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরের সামনে যে শিবমন্দিরটি আছে সেটি রাজা রাখড়চন্দ্রের নির্মাণ করানো মন্দির। মন্দিরের সামনের উপর অংশে রাজার নাম এবং মন্দির নির্মাণের সময়ের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়টি মলুটীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাসড়ার পার্বতী মায়ের প্রকট হওয়া কহিনীর সঙ্গে যুক্ত। কাহিনীটি এইরূপ — "রাজা রাখড়চন্দ্রের সমসাময়িক মাসড়ার এক নিমিবুড়ি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, কোনও দেবী তাঁকে বলছেন — 'আমি এই পুকুরে রয়েছি, তুলে প্রতিষ্ঠা কর।' ঐ সঙ্গে দেবী আরও বলেন — 'আমাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় প্রতিপদে বলিদান দিবি।'

নিমিবুড়ি দরিদ্র মহিলা। তাঁর পক্ষে অত বলিদান যোগার করা সম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ মাসড়া মহালের জমিদার রাজা রাখড়চন্দ্রকে নিমিবুড়ি স্বপ্নের কথা বলে থাকবেন। আবার অন্য একটি জনশ্রুতিতে আছে রাজাও নাকি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। যাই হোক, রাজা রাখড়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিবুড়ি পুকুর হতে (মাসড়ার সুঁড়িপুকুর) দেবীকে তুলে ঘাটে নিয়ে আসেন। দেবীর মূর্তি ছিল প্রায় গোলাকার একটি পাথর। এর দুইপাশে দুটি সাপের

আকৃতি দেখা গিয়েছিল। মূর্তিটি রাখা হয় যে মাটির ঘরে, সেই ঘরে আগুন লাগে এবং ভেঙে পড়ে। ফলে সেই সময় মূর্তিটির যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পূর্বের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

সম্ভবতঃ বলিদানের সংখ্যা কমাবার জন্য সুঁড়িপুকুরের ঘাটেই দেবীর প্রথম পুজা হয়। পূজোর মধ্যেই নিমিবুড়ির ভর হয়। ভরের মধ্যে নিমিবুড়ি পার্বতীমার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলেন — 'আমি এখানেই থাকব'। দেবীর ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে একটি মাটির ঘরে দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজা রাখড়চন্দ্রের বদান্যতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বতী মায়ের প্রতিষ্ঠা সেই হেতু রাজার সম্মানে মলুটীতে মাসড়ার পার্বতী মায়ের পূজা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বছরের প্রথম পুজা ঐ কারণেই মলুটীতে হয়ে থাকে।

আগের দিনে যখন ঔষধ-পত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল না তখন তন্ত্র-মন্ত্র, জলপড়া ইত্যাদিতেই লোক বিশ্বাস করত। গ্রামে-গঞ্জে ঐ রকম বিশ্বাস এখনও দেখা যায়। সে সময় কলেরা, বিসূচিকা, প্লেগ ইত্যাদি রোগ শুরু হলে লোকালয় উজাড় হয়ে যেত। বলা হত মড়ক লেগেছে। সেই সব সময়ে এই অঞ্চলে মাসড়ার পার্বতী মায়ের পূজাই ছিল ভরসা। পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মড়ক থামিয়ে দেন। এইজন্য মাসড়ার পার্বতী মাকে 'মোড়কি পার্বতী' বলা হয়।

প্রাথমিক মূর্তির বিবরণ শুনে মনে হয় ইনি নাগদেবী মনসা। পরে এই দেবীকে চতুর্ভুজা দুর্গারূপে পূজা করা হয়। অন্য দিকে মনসাদেবীর বিবরণে পাওয়া যায় তিনিও চতুর্ভুজা এবং ত্রিনয়নী। পদ্মপুরাণে মনসা বন্দনায় আছে —

'হংসপৃষ্ঠে আরোহিণী চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী
সহস্র ফণা শোভিছে মস্তকে' [৬৯]

আরও জানা যায় যে, রাজা রাখড়চন্দ্রের পুত্র রাজা আনন্দচন্দ্র রায়ের সময় হতে মলুটীর রাজাদের নামেই পার্বতী মায়ের পূজা সংকল্প হত।

এর মধ্যে একটি কৌতূহলের ব্যাপার হচ্ছে মাসড়ায় পার্বতী মায়ের মন্দিরের ভিতর মায়ের মূর্তির পশ্চিমদিকে দুটি আসন আছে।

---

(৬৯) দ্বিজ বংশীদাস - শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ, পৃঃ ১২

ওগুলিতে মাটির ঘোড়া ও প্রতীকী পাথর রাখা আছে। পার্বতী মায়ের পূজোর সঙ্গে ঐ দুটি আসনের দেবতাদেরও পূজো করা হয়। আসন দুটি যথাক্রমে রাখড় রায় (অপভ্রংশে রাখল রায় হয়ে গেছে) এবং বাঘ রায় নামীয় ব্যক্তিদের। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাজা রাখড়চন্দ্র পার্বতী মায়ের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর বাঘ রায়কে ধরমপুর এবং ডামরার মাঝে চণ্ডীঠাকুর রূপে জানা গিয়েছে। এখানেও তাঁকে দেবত্বের আসনে রাখা হয়েছে, সেই জন্য তাঁর, নান্‌কারের তৃতীয় বা চতুর্থ রাজা হওয়ার সম্ভবনা, আরও খানিকটা বেড়ে যায়। [৭০]

তৃতীয়টি একেবারেই পরোক্ষ। রাজা রাখড়চন্দ্রের দ্বারা কিছু জমি ও পুকুর দানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা। নান্‌কারের রাজা রাজচন্দ্র এবং নগরের রাজা কামাল খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন নগরের রাজার সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যের কাছে নান্‌কারের সৈন্য যখন পিছু হঠছে এবং যুদ্ধে নান্‌কারের রাজার পরাজয়ের সম্ভাবনায় বেশী, সেই সময় নান্‌কার রাজ্যের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী হরি দোলুই রাজপরিবারের সদস্যগণ যাঁরা রাজবাড়িতে ছিলেন যেমন, রাজমাতা ও তাঁর তিন নাবালক পুত্র, সকলকে পাল্কিতে করে ডামরা হতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভটিনাতে নিয়ে আসেন। যুদ্ধে রাজা রাজচন্দ্র নিহত হন। হরি দোলুই, শত্রুসৈন্য রাজবাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই রাজপরিবারের সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, সেই উপকারের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজা রাখড়চন্দ্র হরি দোলুইকে একটি পুকুর সহ পঞ্চাশ একর জমি দান করেছিলেন। মালিকের নাম অনুসারে পুকুরটির নাম হয় হরিদলুই বা হরদলুই পুকুর। জমিগুলি ও পুকুরটি মলুটীর পাশে পুরন্দরপুর মৌজায় অবস্থিত। রেকর্ড রয়েছে হরি দোলুই এর অধস্তন কোন এক ওয়ারিশ সুন্দরী বাগতির নামে। উত্তরাধিকারীগণ বিভিন্ন জায়গায় থাকেন এবং পুষ্করিণী সহ প্রায় জমিগুলি বিক্রি হয়ে গেছে। কেবল অতীতের স্মৃতিটুকু উজজ্বল করে রাখতে পুকুরের নাম হরিদোলুই আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

রাজা রাখড়চন্দ্র মলুটীতে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালের মধ্যেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হরি দোলুইকে জমি ও পুকুর নিশ্চয়

(৭০) প্রাক্তন শিক্ষক এবং পার্বতী মায়ের সেবাইত, মাসড়া গ্রামনিবাসী শ্রীদেবীদাস দেবাংশী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

দিয়েছিলেন। সেই হিসাবে আজকের হরিদোলুই পুকুর রাজা রাখড়চন্দ্রের দান ধরলে তথ্যটি অমূলক হবে না।

রাজা রাখড়চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেসব অলৌকিক কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্তরূপ এই প্রকার —

(১)

রাখড়চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্তির পর দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিতান্ত উৎসুক ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে কাশী হতে গুরু মহারাজ অনেকদিন মলুটী আসেন নাই। তবে, এরই মধ্যে একদিন কাশী সুমেরু মঠের দণ্ডিস্বামী কামাখ্যাতীর্থ দর্শনের পর মলুটীর পথে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাচ্ছিলেন। রাখড়চন্দ্র তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তির জন্য বারবার অনুনয় করলেও তিনি দীক্ষাদান হেতু একদিনও অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না। পরদিন প্রত্যুষের আগেই নীলাচলের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

যথাসময়ে দণ্ডিস্বামী পুরীধামে পৌঁছে মহাপ্রভুর দর্শনের আশায় মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনের আনন্দে শত শত ভক্তের জয়ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত কিন্তু সন্ন্যাসী মহারাজ দুই চোখেই অন্ধকার দেখছেন। শ্রীমূর্তির দর্শন সম্ভব হল না। দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা হল। এবারেও শ্রীমূর্তির দর্শন পেলেন না। সন্ন্যাসী মহারাজের মনে ভীষণ ধাক্কা লাগল। তিনি স্থির করলেন যতক্ষণ মহাপ্রভুর দর্শন না পাবেন ততক্ষণ মন্দিরের সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবেন। ঐ অবস্থায় দীর্ঘসময় থাকার পর তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভু আদেশ করলেন — "তুমি আমার ভক্ত রাখড়চন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তুমি যাবৎ রাখড়চন্দ্রকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত না করিবে, তাবৎ তুমি আমার মূর্তি দর্শনে সমর্থ হইবে না।"

সন্ন্যাসী মহারাজ এবার রাখড়চন্দ্রকে দীক্ষা না দিয়ে চলে আসার জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মলুটীর পথে পা বাড়ালেন। মলুটী পৌঁছে রাজা রাখড়চন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। শেষে নিজের কৃতকার্য্যের জন্য রাখড়চন্দ্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। এবার যাত্রাপথে কোনও অন্তরায় হল না এবং তিনি মহা আনন্দে জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি দর্শন করলেন।

(২)

মলুটী থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নিরিশা মৌজায় রাজার নির্দেশে সেচের জন্য একটি বড় পুকুর কাটানো হচ্ছিল। কিছুটা গভীর পর্যন্ত খোঁড়ার পর একটি মন্দিরের উপর অংশ দেখা যায়। অত্যন্ত সাবধানে মন্দিরের চারিপাশের মাটি কেটে মন্দিরের অবয়বটি বের করা হয়। রাজা রাখড়চন্দ্রের কাছে খবর গেল। মন্দিরের ভিতর কোন দেব-দেবী থাকার সম্ভাবনায় তিনি তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌছুলেন। কাহিনীতে আছে মন্দিরের দরজা ছিল লৌহময়। কর্মচারীরা অনেক চেষ্টা করে মন্দিরের যে লোহার দরজা খুলতে পারে নাই, রাখড়চন্দ্র কপাটে হাত দেওয়া মাত্র সশব্দে দরজা খুলে গেল। ভিতরে এক প্রাচীন যোগী সমাধিতে লীন ছিলেন। রাজা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই সেই যোগীপুরুষ চোখ খুললেন। রাজার হাতে তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দেখে বললেন — "পত্রের আকার ও জলের বর্ণ দেখে মনে হচ্ছে এখন কলিযুগ উপস্থিত আর তুমি রাজা রাখড়চন্দ্র"। ভূগর্ভস্থ মন্দিরের মধ্যে থেকে যোগী কিভাবে তাঁর নাম জানলেন, বিস্মিত রাজা সেটি জানার জন্য বিনীতভাবে ঐ মহাপুরুষকে অনুরোধ করলেন।

যোগী মহারাজ উত্তরে যা বললেন তার সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে যে তিনি দ্বাপরযুগের মধ্যকালে এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মৃগয়া তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একবার মৃগয়ার জন্য এই স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েন। তখন বর্ষাকালের এক অপরাহ্ন। মেঘের জন্য সবদিক অন্ধকার। বিদ্যুতের আলোকে এই মন্দিরটি দেখে আশ্রয়ের আশায় এখানে আসেন। মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তিনি মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বারবার অনুনয় করলেন। তাঁর কাতর অনুরোধে যখন কেউ উত্তর দিল না তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সজোরে লাথি মেরে দরজার কপাট ভেঙে দিলেন। সেই ভাঙা কপাট মন্দিরের মধ্যস্থলে বসে থাকা একজন মানুষের উপর পড়ল এবং মাথা কেটে রক্তের ধারা বইল। ঐ ব্যক্তি ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত মহাতাপস। তিনি ঐ রাজাকে তাঁর কর্মের জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে বললেন — 'তুমি যে দুষ্কর্ম করেছো তার ফলে লৌহময় কপাটে আবদ্ধ হয়ে জীবিতাবস্থায় যুগ-যুগান্তব্যাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করো'। রাজা তাপসের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে

অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর 'দণ্ডভোগের কাল নির্ধারণ ও ভোগ শেষে মুক্তির উপায়ের জন্য প্রার্থনা করলেন।' তাপসের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হল। "তিনি কহিলেন কলিযুগে রাজা বাজবসন্তের বংশে রাখড়চন্দ্র নামক জনৈক পরম ধার্মিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শে তুমি পাপমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে"। যোগীপুরুষ বললেন, রাজা রাখড়চন্দ্রের স্পর্শ ছাড়া মন্দিরের লোহার দরজা খুলবে না। সেইজন্য রাজাকে তাঁর চিনতে কষ্ট হয় নাই। তিনি এবার রাজা রাখড়চন্দ্রকে সেখান হতে চলে যাবার আগে মন্দিরটি পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন এবং তাঁর বংশের কেউ যেন এই পুকুরটি আর খনন না করে, সেই নির্দেশ দিলেন।

তখন হতে ঐ পুকুরটি 'আধখোঁড়া পুকুর' নামে পরিচিত। কিম্বদন্তীটি খুব প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে কৌতূহলবশতও মন্দিরটি কেউ খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করেননি, ফলে কিম্বদন্তীর পিছনে সত্যতার পরিমাণ এখনও যাচাই সম্ভব হয় নাই।

(৩)

রাজা রাখড়চন্দ্রের মৃত্যুর মধ্যেও অলৌকিকতার সংবাদ পাওয়া যায়। স্ত্রী বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দচন্দ্রের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে তিনি নীলাচলে চলে যান। তখনকার দিনে হাঁটাপথে যেতে হত, পথে ছিল চোর-দস্যুর ভয়, সে সব কিছু না মেনে তিনি জগন্নাথ মহাপ্রভুকে স্মরণ করে একবস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পথ চলতে থাকেন। দীর্ঘদিন পর জীর্ণবেশে শীর্ণদেহে শ্রীক্ষেত্রে পৌছান। মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর দীন-হীন অবস্থার জন্য পাণ্ডারা বাধা দেয়। এইভাবে তিনদিন, তিনি জগন্নাথদেবের দর্শন পাবার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। তৃতীয় দিনের শেষে মন্দিরের পিছন দিকে একস্থানে দাঁড়িয়ে কাতরপ্রাণে মহাপ্রভুকে ডাকতে লাগলেন। "রাখড়চন্দ্র যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সহসা সেই স্থানে তিনি প্রবেশের পরিমিত স্থান উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথে মন্দির প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে প্রবেশপূর্বক জগন্নাথদেবের পদতলে শয়ন করিয়া শ্রীমূর্তি চিন্তা করিতে করিতে পঞ্চত্ব লাভ করিলেন।" যে পাণ্ডারা দীনহীন ব্যক্তিটিকে গত তিন দিন মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় নাই এখন তাঁকে মহাপ্রভুর পদতলে দেহরক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হল।

ইতিমধ্যে মলুটীর পাণ্ডা রাজাকে চিনতে পেরে তাঁর যথাযোগ্য সৎকার করায় এবং মলুটীতে রাজার মৃত্যু-সম্বন্ধীয় খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করে।*

(৪)

এ অঞ্চলে একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ আছে 'মা তারা নাটোরের রাজার খান আর নান্‌কারের পানে চান'। এর অর্থ হচ্ছে মা তারার ভোগসেবার খরচ নির্বাহ করেন নাটোরের রাজা আর বছরের মধ্যে একদিন বাইরে এসে মা তারা নান্‌কার মলুটীর পানে চেয়ে থাকেন। এই প্রবাদের উৎস হিসাবে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেটিও রাজা রাখড়চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

রাখড়চন্দ্র রাজা উপাধিধারী বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও উগ্রতারার পূজার জন্য নিয়মিত তারাপীঠ যেতেন। মলুটী হতে জঙ্গলাকীর্ণ পথে তারাপীঠের দূরত্ব মাত্র দশ-বারো কিলোমিটার। দুই একজন বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে রাজা মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে তারাপীঠের পথে রওনা দিতেন। প্রত্যূষেই পৌঁছে যেতেন তারামায়ের মন্দিরে, পূজা সেরে ফিরে আসতেন মলুটীতে। একবছর দুর্গাপূজার পর শুক্লা চতুর্দশীর দিন তিনি পৌঁছে যান তারাপীঠ। প্রতিবছর চতুর্দশীর দিন ভোরে মা তারার প্রতিমাকে বাইরে বিরামখানায় দক্ষিণমুখ করে বসানো হয়। সেদিনও তাই করা হয়েছিল। রাজা তারপীঠ পৌঁছে বিরামখানায় মা তারার পূজায় বসে গেলেন। তারাপীঠে তখন কৌল সন্ন্যাসীদের প্রাধান্য। কয়েকজন কৌল সন্ন্যাসী হৈ হৈ করে ছুটে এসে রাজাকে পূজো থেকে উঠিয়ে দিল। তাদের বক্তব্য কৌল অবধূত এখনও পূজা করেন নাই আর তাদের অবধূতের আগে কারও তারা মায়ের পূজা করার অধিকার নাই। ক্ষুব্ধ রাজা দ্বারকা নদীর পশ্চিম পাড়ে ঠিক বিরামখানার সামনে চলে এলেন। সেখানে খানিকটা জায়গা পরিস্কার করিয়ে নূতন করে ঘটস্থাপন করে অসমাপ্ত পূজা সমাপ্ত করার জন্য বসে গেলেন। রাজার নয়নে অশ্রু, আকুল হৃদয়ে ডাকতে লাগলেন মা তারাকে। বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল বিরামখানায়। প্রতিমার মুখ পশ্চিমে রাখড়চন্দ্রের দিকে ঘুরে গিয়েছে। ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়লেন মা তারা। সিদ্ধঘট মাথায় নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে রাখড়চন্দ্র ফিরে এলেন মলুটীতে। এরপর হতে তিনি আর তারাপীঠে পূজো করতে যাননি। দীর্ঘদিন পর রাখড়চন্দ্র যেখানে পূজো দিয়েছিলেন সেই জায়গায় পূজো দেওয়ার জন্য মা তারার স্বপ্নাদেশ পান রাখড়চন্দ্রের পুত্র রাজা আনন্দচন্দ্র। রাজা আনন্দচন্দ্রের সময় হতেই দুর্গাপূজার পর শুক্লা চতুর্দশীতে মলুটীর তরফ হতে দ্বারকা নদীর পশ্চিম পাড়ে বিরামখানার সামনে মা তারার প্রথম পূজো আজও হয়ে আসছে। ঐ দিন বিরামখানায় মা তারার প্রতিমাকেও পশ্চিমমুখে বসানো হয়।

দণ্ডিস্বামীর নিকট রাখড়চন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, আধখোঁড়া পুকুর-প্রসঙ্গ এবং নীলাচলে রাখড়চন্দ্রের অলৌকিক মৃত্যু, এই তিনটি কাহিনী 'মলুটী রাজবংশ' হতে গৃহীত।

পুরাতন কিম্বদন্তীগুলি স্বভাবতই অতিরঞ্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে রাখড়চন্দ্র সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীগুলিও প্রক্ষিপ্তদোষযুক্ত হয়ে থাকার সম্ভবনা বেশী। তথাপি রাজা রাখড়চন্দ্রের মৌলিক কর্মধারা বিচার করে তাঁকে সাধকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা কোনও রকম অযৌক্তিক নয়।

রাজা আনন্দচন্দ্র (১৭৩৫-১৭৮০)

রাজা আনন্দচন্দ্র মলুটীতে নান্‌কারের দ্বিতীয় রাজা। তিনি একজন বিচক্ষণ প্রশাসক ছিলেন বলে জানা যায়। ডামরা যুদ্ধের পর কিছু অঞ্চল নান্‌কারের রাজাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন হতেই নান্‌কারের সম্পত্তি খানিকটা অস্পষ্টতার মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। রাজা রাখড়চন্দ্র বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন না, বিষয় সম্পত্তির দিকে কখনও নজর দেন নাই। রাজা আনন্দচন্দ্রই সর্বপ্রথম নিরপেক্ষভাবে নান্‌কারের সমগ্র সম্পত্তি জরিপ করিয়ে অংশীদারদের অধিকারের সীমা নির্ধারণ করান। তবে মলুটী রাজবংশে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকেও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। একাধিক গুণীজন নিয়ে তাঁর একটি সভাও ছিল।

আনন্দচন্দ্রের সভা ও ভবানীমঙ্গল কাব্য — আনন্দচন্দ্রের সভাসদদের মধ্যে 'ভবানীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাড়া অন্য কোনও সভাসদের নাম পাওয়া যায় না। গঙ্গানারায়ণ যে রাজা আনন্দচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন ভবানীমঙ্গল কাব্যগ্রন্থের প্রশস্তিতে তিনি

সেটা পরিস্কারভাবে লিখেছেন —

"ব্রাহ্মণ কুলের মণি সকল সভাতে জিনি
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায়।
তার সভাসদ কবি চণ্ডীর চরণ ভাবি
দ্বিজ গঙ্গানারায়ণে গায়।।" [৭১]

এই গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গৌরবান্বিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারী ওঝার এক পুত্রের নাম বনমালী। বনমালীর পুত্র 'রামায়ণ' রচয়িতা স্বনামধন্য কৃত্তিবাস পণ্ডিত। আবার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এক জ্যেষ্ঠতাত মদনের বংশে দশম পুরুষ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্ম। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অন্য এক জ্যেষ্ঠতাত অনিরুদ্ধের বংশে দশম পুরুষ 'ভবানীমঙ্গল' কাব্য প্রণেতা গঙ্গানারায়ণ। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) ও গঙ্গানারায়ণ সমসাময়িক। কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মত দেশবিখ্যাত কবিদের বংশে গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করে বাংলাকাব্যের ধারাকে চির উজজ্বল করে রেখেছেন।

গঙ্গানারায়ণের পূর্বপুরুষের বাস ছিল বর্ধমান জেলার মেটেরী গ্রামে। ভবানীমঙ্গল কাব্যে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —

নিবাস মেটেরী গ্রাম পিতামহ রামরাম
তিতুরাম তাহার নন্দন।
তার সুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ
উমা-গীত করিল রচন।

গঙ্গানারায়ণের পিতা তিতুরাম মুখোপাধ্যায় পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করে মলুটীর তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হস্তিকাঁদা গ্রামে এসে বাস করেন। হস্তিকাঁদা গ্রাম হতেই গঙ্গানারায়ণ, রাজা আনন্দচন্দ্রের সভায় আসা-যাওয়া করতেন। তিনি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এক সময় আনন্দচন্দ্র, নান্‌কার রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে দেওয়ান আলিনকি খাঁর সঙ্গে দাবা খেলার জন্য তাঁকে রাজনগর পাঠান।

যে ভবানীমঙ্গল কাব্যের জন্য গঙ্গানারায়ণ প্রতিষ্ঠিত কবি বলে স্বীকৃত,

(৭১) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল - পুঁথি পরিচয় (৪র্থ খণ্ড)

সেই কাব্যগ্রন্থটি মলুটীতে সভাসদ থাকাকালীন তিনি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ভবানীমঙ্গল কাব্যের প্রশস্তিতে তিনি কেবল আনন্দচন্দ্রকেই মহত্ব দেন নাই, সার্বিকভাবে বাজবসন্তর বংশধরদের জন্যও কল্যাণ কামনা করেছেন। ঐ কাব্যের এক অংশে তিনি লিখেছেন —

মহারাজ বসন্তের সন্ততি সকলে।
কৃপা করি রাখ মাতা কল্যাণ কুশলে।।

রাজা আনন্দচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণকে যথেষ্ট নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দিয়ে তাঁর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে কাব্য রচনা করার সুযোগ হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, রাজা আনন্দচন্দ্রের সভাসদ থাকাকালীন তিনি ভবানীমঙ্গল কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। [৭২]

পণ্ডিতদের জন্য বৃত্তিদান — আনন্দচন্দ্রের একটি প্রকল্প ছিল পণ্ডিতদের জন্য বৃত্তিদান ব্যবস্থা। দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন স্থান হতে আগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে নগদ টাকায় বৃত্তি দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হত। সংক্ষেপে এই ব্যবস্থার নাম ছিল 'পণ্ডিত বিদায়'। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসী। তাঁরা দুর্গাপূজার অনেক আগেই মলুটী পৌঁছে যেতেন। মলুটীর রাজাদের বৃত্তিদানের সূচীতে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম থাকত, তাঁরা সাধারণের চোখে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি বলেই স্বীকৃত হতেন। মলুটীর রাজাদের কাছে বৃত্তিলাভ রাঢ় অঞ্চলে খুবই গৌরবের বিষয় ছিল। এঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন একটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতেন। কেউ হতেন গায়ক অথবা বাদক, আবার কেউ ছিলেন জ্যোতিষ অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। এমনকি ভাল খাইয়ে হওয়ার জন্যও রাজাদের কাছে বৃত্তি পেয়ে এসেছেন এমন প্রবাদও শোনা গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই বৃত্তি ব্যবস্থা বংশগত হয়ে যায় এবং গুণগত মর্য্যাদাও হ্রাস পায়।

দুর্গাপূজার আগমনী গান শুরু হওয়ার পূর্ব হতেই ঐসব গুণী ব্যক্তিরা গ্রামে পৌঁছে আসর জমিয়ে রাখতেন মাসাধিক কাল। বিভিন্ন তরফের রাজাদের বৈঠকখানায় তখন সকাল সন্ধ্যায় বসত ভরপুর আড্ডা।

(৭২) তথ্যসূত্র — শিবরতন মিত্র - প্রবাসী, কার্তিক সংখ্যা ১৩১৭, পৃঃ ৮৬-৮৯

কোথাও শোনা যেত উচ্চমার্গের সঙ্গীত অথবা শ্যামাসঙ্গীত। কোথাও আবার চলত কীর্ত্তন গান অথবা আঙ্গুলে তুড়ি মেরে নিধুবাবুর টপ্পা। আবার কেউ দেখাতেন ক্যারিকেচার। হাসির হুল্লোড় উঠত আসরের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে। সারা গ্রামে এক অপূর্ব প্রাণের জোয়ার ঢেউ খেলত ঐ একমাস ধরে।

যদি কোনও বছর কেউ স্বয়ং মলুটী আসতে অসমর্থ হতেন, সেক্ষেত্রে বাবুদিকে চিঠি লিখেও বৃত্তির অর্থ পেয়ে যেতেন। এই ব্যাপারে একশো চৌদ্দ বছর আগের একখানি চিঠির উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাটোয়া হতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নাম বক্রেশ্বর শর্মা চিঠিখানি লিখেছেন। তিনি অসুস্থ থাকায় অনুরোধ করেছেন যে, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির হাতে তাঁর বৃত্তির টাকাটা যেন দেওয়া হয়। চিঠিখানি এইরূপ —

পোঃ কাটোয়া, হরগৌরীতলা রমনীর বাটী
১৩০২ সাল, ১১ই মাঘ।

অত্রেব শ্রীযুক্ত রাজা সম্বন্ধীয় বাবুজী মহাশয়গণ,

সমীপে নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্খি এই ভিক্ষুকের নমস্কার জানিবেন। আমার বার্ষিক বৃত্তির টাকা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বাবাজীকে দিয়া আমার এই বিপদের সময় রক্ষা করিবেন। ....

ইতি —
বক্রেশ্বর শর্ম্মা [৭৩]

দীর্ঘ দুইশত বছর ধরে নান্‌কার মলুটীতে পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক জমিদারী বিলোপ আইন কার্য্যকরী হলে পণ্ডিত বিদায় প্রথা সম্পূর্ণভাবে উঠে যায়।

বর্গী আক্রমণ — 'ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো, বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে ?'

সারা বাংলার সঙ্গে নান্‌কার মলুটীতেও ছেলেদের জন্য এই ঘুমপাড়ানি গান

(৭৩) *Exibit 3 - বক্রেশ্বর শর্মার লেখা চিঠির প্রতিলিপি।*

শোনা যেত প্রায় প্রতিঘরেই। এই গানের ভিতরে রয়েছে তদানীন্তন বাংলায় বর্গী আক্রমণের ভয়াবহ চিত্রটি। রাজা আনন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে এমনই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল বাংলায় উপর্য্যুপরি বর্গী আক্রমণ। "১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা এবং বিহারে কয়েকবার বর্গী আক্রমণ হয়। ১৭৪২ এ বালাজী বীরভূম হয়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাবার চেষ্টা করেন। পুনরায় ১৭৪৫ এ রঘুজীরও গন্তব্যপথ ছিল সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূম হয়ে মুর্শিদাবাদ পৌঁছানো। ১৭৪৮ এ মীর হাবিবের অধীনে মারাঠা, সাঁওতাল পরগনার ভিতরে প্রবেশ করে পাকুরের হিরণপুরে আস্তানা গাড়ে। ১৭৪৯ থেকে ১৭৫০ পর্য্যন্ত বাংলায় লুটপাট চলে পূর্ণোদ্যমে" [৭৪] সে সময় রাজনগরের রাজা ছিলেন বদি-উল-জমা খাঁ (১৭১৮-১৭৫২)। তাঁর পক্ষে মারাঠা বর্গীদের প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে রাজনগর, সিউড়ী, কচুজোড়, হেতমপুর অঞ্চল দারুণভাবে লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদিও পার্শ্ববর্তী রাজ্য রাজনগরের অধিকারভূক্ত কয়েকটি স্থানে বর্গী আক্রমণের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায় কিন্তু নান্‌কার তালুকের মধ্যে কোনও প্রকার আক্রমণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বহুমুখী কৃতিত্বের জন্য এখানকার লোকেরা রাজা আনন্দচন্দ্রকে এখনও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁর দ্বারা নির্মিত সেচের জন্য বিশাল দীঘি 'আনন্দসাগর' তাঁর নামকে বহুকাল অক্ষয় করে রাখবে।

*

(দেওয়ানী আমল)

রাজা জগচ্চন্দ্র (১৭৮০-১৮১০)

জগচ্চন্দ্র মলুটীতে নান্‌কারের তৃতীয় রাজা। তাঁর সম্বন্ধে পূর্ববর্তী রাজাদের মত কোনও প্রচলিত কিম্বদন্তী শোনা যায় না, তবে রাজার তরফের সবচেয়ে উঁচু শিবমন্দিরটিতে তাঁর নাম উৎকীর্ণ আছে। ঐ মন্দিরটি তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তাঁর রাজত্বকালে মলুটী নান্‌কার তালুকের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য্যের বিবরণ তদানীন্তন বীরভূম জেলার সরকারী রেকর্ডে উল্লেখ আছে।

(৭৪) ***P. C. Roy Chowdhury — Santal Pargana Gazetteers, Page - 60***

নান্‌কার মলুটীর উপর খাজনা ধার্য্য — ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। বাংলায় শুরু হয় দ্বৈতশাসন। নামমাত্র নবাবের হাতে থাকে ফৌজদারী কর্তৃত্ব এবং কোম্পানীর হাতে দেওয়ানী অর্থাৎ অর্থ সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের আইন-কানুন, আদালত-কাছারির প্রচলন শুরু করে। কোম্পানী ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বাংলার গর্ভনর হতে ভারতের গর্ভনর জেনারেলের পদে উন্নীত করে। তিনি তখন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শোধরাবার জন্য বাংলা, বিহার, এবং উড়িষ্যার প্রচলিত ভূমিকরের পরিবর্তনে সচেষ্ট হলেন। সেই সময় মলুটীর নান্‌কার তালুক তাঁর নজরে আসে। হেস্টিংস তাঁর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নবাব কাসেম আলির পেস্কস বা নজরানার অনুরূপ নান্‌কারের উপর কর ধার্য্য করতে নির্দেশ দেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঁন্দির রাজাদের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মলুটী এসে নান্‌কারের উপর কেবলমাত্র ২৭৯ টাকা ২৫ পয়সা খাজনা ধার্য্য করেন। উপরন্তু বর্ধমানের মহারাজার মাধ্যমে কোম্পানীর ঘরে ঐ পরিমাণ খাজনা জমা করার ব্যবস্থা করেন। বর্ধমানের মহারাজা আবার মল্লারপুর এষ্টেটের মোহান্ত দ্বারা মলুটীর কাছারি হতে ঐ অর্থ নিয়ে যেতেন। পরে, কোম্পানী ঐ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২৮২ টাকা ৯৭ পয়সা মোকরারী জমা (অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিহীন) বলে মেনে নেন। সেই সময় বীরভূমের রাজা বাহাদুর-উল-জমা-খাঁ নাবালক থাকায়, বীরভূমের কালেক্টার সি, কিটিং ও দেওয়ান লালা রামনাথ বীরভূম সম্বন্ধীয় রাজস্বের তদারকির জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। মলুটী নান্‌কারের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে লালা রামনাথের মাধ্যমে মলুটীর রাজারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করেন। ঐ আবেদনপত্রের উপর কিটিং সাহেবের মুখবন্ধ পত্রটি ছিল নিম্নরূপ —

To
Jhon Shore esq.
President & Co.
Members of the Board of Revenue
Fort William.

Gentlemen,

I have the honour to inform you that in consiquence of the representation of the Zemindarry Lalla Ram Naut, I have thought proper to depute Ram Narain Soor, 2 Mohrers & 2 peons, to enquire into a stated excess of Nankar Zumun in Moluty, amounting to Bighas 27000.

The Barrakurd or Establishment Delivered to the aumeen.
I now transmit for the information of the Board.

Beerbhoom
the 10th Decr. 1788

am & Ca.
Signed / C. Keating [৭৫]
Collr.

1.	Aumeen	-	Rs. 16
2.	Mohurrers	-	Rs. 12
3.	Peons	-	Rs. 6

ঐ চিঠির জবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই। কোম্পানী সম্ভবতঃ খাজনা কমায় নাই। কেননা, পরে ইষ্টার্ন রেলের লুপ লাইন তৈরী করার সময় নান্‌কার তালুকের অনেকটা জায়গা রেলের দখলে চলে যায় এবং ঐ বাবদ তিন টাকা পচাত্তর পয়সা খাজনা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৭৯ টাকা ২২ পয়সা দাঁড়ায়। নান্‌কার মলুটী হতে ঐ পরিমাণ খাজনা জমিদারী বিলোপ পর্যন্ত দেওয়া হয়ে এসেছে।

আবগারী শুল্ক ধার্য্য — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বীরভূমের জমিদারদের কাছ হতে পরিবর্তিত খাজনা আদায় বাদে অন্যান্য স্বাধীন আয়গুলিতেও ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ঐ সময় জমিদারগণই মদ তৈরী এবং বিক্রির উপর শুল্ক উশুল করতেন। ভেণ্ডারের বন্দোবস্তও জমিদারের হাতে থাকত। আবগারী শুল্ক বাবদ নান্‌কার জমিদারীতে বেশ মোটা রকম আয় হত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের কালেক্টার এফ. ফিজরয় নান্‌কার মলুটীতে আবগারী দোকানের সংখ্যা এবং আবগারী শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি নির্দেশনামা পাঠান। এর ফলে নান্‌কারের রাজাদের একটা নির্দিষ্ট বড় রকমের আয় বন্ধ হয়ে যায়। বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর এফ. ফিজরয়ের ঐ আদেশটি ছিল পরপৃষ্ঠার অনুরূপ —

---

(৭৫) *West Bengal District Records - Birbhum 1786 - 1797 & 1855, Page 12*

Detailed Settlement of the Abharry of Zillah Beerbhoom Specifying the Pergunnah Villages and number of shops in which Liquors are to be sold according to the new assessment for the year 1200 B.S. :-

Pergunnah	Name of the village	No. of Patchoye Shop in each village	Daily Tax upon each shop	No. of Stills in each village	Daily Tax on each Still	Amount daily demand Still & Patchoye	Amount P. Mensum or Ditto	Amount to the end of the current Bengal Year 1200 B.S.	Total upon each Pergunnah to the end of Year of 1200 B.S.
Nuncur	Bansra	2	30	-	- 6 - 0	- 6 - 0	11 - 4 - 0	83 - 7 - 0	170 - 4 - 0
Mullottee	Catghureah	1	30	-	- 6 - 0	- 3 - 0	5 - 10 - 0	40 - 11 - 0	
Mullottee	Mullottee	1	30	-	- 6 - 0	- 3 - 0	5 - 10 - 0	46 - 2 - 0	

Zilla Beerbhoom
the 21st. November 1793

Errors Excepted
(Signed) F. Fitzroy [৭৬]

(৭৬) ***West Bengal District Records - Birbhum 1786 - 1797 & 1855, Page 53***

আবগারী শুল্ক বাবদ কোম্পানী বীরভূম জেলার ২৭টি পরগনায় মোট ১০,২২৩ টাকা ১৩ আনা কর ধার্য্য করে। এর মধ্যে মলুটী নান্‌কারের তিনটি গ্রামের দেয় শুল্কের পরিমাণ ছিল ১৭০ টাকা ৪ আনা।

পুলিশের জন্য কর ধার্য্য — পুলিশের উপর কর ধার্য্য নান্‌কার মলুটীর উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৃতীয় পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে বীরভূমের কালেক্টর সি. ট্রিয়ারের চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ —

Statement of the names of Pergunahs in the Zillah of Beerbhoom the amount assessed upon each Pergunah for Defraying the Expense of Police for the year of 1203 B.S. and names and Descriptions of the collector of the Assessment.

Names of the Pergunahs	Amount of the Assess-ment	Amount required by the Magistrate for the support of police	Name of the collector of the Assessment	Description of the Collector
Nankar Mouloty	179-11-4	11,112	Nuffer Chunder Sharma	Appointed for the express purpose of collecting Tax

Zilla Beerbhoom
the 1st of August 1796

Errors Excepted
(Signed) C. Tryer [৭৭]
Collector

কোম্পানী নিজস্ব পুলিশি ব্যবস্থা শুরু করার আগে রাজা-জমিদাররাই ছিলেন প্রজাদের রক্ষাকর্তা এবং বিচারকর্তা। অশান্তি দমনের জন্য ছিল নিজস্ব পাইক, বরকন্দাজ এবং লাঠিয়াল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩৭নং রেগুলেশন

(৭৭) ***West Bengal District Records - Birbhum 1786 - 1797 & 1855, Page 66***

অনুযায়ী দেশীয় জমিদারদিকে কোম্পানী তার নিজের পুলিশি ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করে। পুলিশের খরচও জমিদারীগুলি হতে উশুল করা শুরু হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐ আদেশনামায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বীরভূম জেলার ২২টি পরগনা হতে পুলিশি খরচ বাবদ আয় ধার্য্য করে। ১১,১১২ টাকা। ঐ খাতে নান্‌কার মলুটীর উপর কর ধার্য্য হয়েছিল ১৭৯ টাকা ১১ আনা ৪ পাই।

রাজা মোহনচন্দ্র (১৮১০-১৮৪০) মোহনচন্দ্র মলুটীতে নান্‌কারের চতুর্থ রাজা। এঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। এমন কি, তাঁর সম্বন্ধে কোন কিম্বদন্তীও শোনা যায় না। মলুটীর কোন মন্দিরেও তাঁর নাম উৎকীর্ণ নাই।

রাজা ঈশানচন্দ্র (১৮৪০-১৮৭০) ঈশানচন্দ্র মলুটীতে নান্‌কারের পঞ্চম রাজা। এঁর রাজত্বকালে সাঁওতাল বিদ্রোহ এক মহত্ত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ ঘটনা নান্‌কার রাজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা বিভাগ ও বীরভূম জেলায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাতে সার্বিকভাবে নান্‌কার তালুকের যথেষ্ট ক্ষতি হয় কিন্তু কৌতূহলের বিষয় নান্‌কার তালুকের রাজধানী মলুটীর উপর সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণের কোন রকম প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাঁওতাল বিদ্রোহ — "১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন হতে প্রায় ছয় মাসকাল সিদো-কানহুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে।" [৭৮] সেই সময়কার সরকারী চিঠিপত্রে বা স্থানীয় সংবাদপত্রে ঐ বিদ্রোহের ব্যাপ্তি মোটামুটি জানতে পারা যায়। "১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই সাঁওতাল বিদ্রোহীরা রামপুরহাটের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বেলিয়া মৃত্যুঞ্জয়পুর এবং নারায়ণপুর গ্রামে তাণ্ডবলীলা চালায়। ২৩শে জুলাই গনপুর এবং পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামগুলিকে বিদ্ধস্ত করে"। [৭৯] আবার মলুটী সংলগ্ন

(৭৮) *K. K. Dutta - The Santhal insurrection of 1855-57, Page 15*

(৭৯) *D. D. Majumdar - WB District Gazetteers, Birbhum, Page 118*

মাসড়া গ্রামে জুলাই মাসের শেষদিকে বিদ্রোহীরা ভয়ানক আক্রমণ চালায়। সংবাদ প্রভাকর নামে সংবাদপত্রে এই খবরটি প্রকাশিত হয় — "অদ্য বর্ধমানের কমিশনার শ্রীযুক্ত এলবার্ট সাহেব নদীয়া ডিবিসনের কমিশনার এ. সি. বি. জে. এল. সাহেবকে পত্র লেখেন। উক্ত পত্রবাহকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম জঙ্গীপুরের দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মলুটী-মাসড়াতে অনুমান তিন সহস্র সাঁওতাল একত্রিত হইয়া উক্ত গ্রামে অগ্নি প্রদান করিলে, উক্ত কমিশনার সাহেব নিকটস্থ রামপুরহাট নামক গ্রাম হইতে অগ্নির ধূম দৃষ্টিকরতঃ থানা খরবোনার ৫ জন চাপরাশীকে তখন ঘটনাস্থলের সংবাদ জ্ঞাত করার জন্য প্রেরণ করেন — সংবাদ প্রভাকর ৫৩০৩ সংখ্যা, শুক্রবার ১৯ শে শ্রাবণ, ইং ৩ আগষ্ট ১৮৫৫"। [৮০]

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, নান্‌কার তালুকের অনেক সাঁওতাল ঐ বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। বক্তব্যটির সমর্থন মেলে নান্‌কার তালুকভুক্ত বেনাগড়িয়া গ্রামের দেশমাঝি ছট্টরায়ের স্বীকারোক্তি থেকে — "আমার যতদূর মনে পড়ে, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগেই আমাদের পূর্বপুরুষরা নান্‌কারে প্রবেশ করেছিল। নান্‌কারে এখন যে সমস্ত গ্রাম আছে, তার দু-একটি ছাড়া সমস্তই ঐ সময় থেকে আছে। ঐ সময় বেনাগড়িয়াতে ছিলেন দুর্গা মাঝি ও মাতড়ু পারগানা, বারোমসিয়াতে রামপারগানা, জাম্বড়োতে মণি পারগানা এবং রাজা ছিলেন মোলহুটিতে ইচনচাঁদ রায় (ঈশানচন্দ্র রায়)। বিদ্রোহের পর তাঁর ছেলে মাহেরচাঁদ রায়ের (মেহেরচন্দ্র রায়) সময়েই তাদের বংশধররা বেড়ে অনেকেই রাজা হলেন। ....আমরা বেনাগড়িয়ায় থাকবার সময় বিদ্রোহ হয়েছিল, সে সময় আমি কিশোর, বয়স প্রায় ১৪ কিংবা ১৫ বছর। .... সিদো-কানহু মহেশপুর লুট করতে গেছে শুনে নান্‌কারেও দুজন নেতা আবির্ভাব হল। একজন জাম্বড়োর মণি পারগানাইত। অন্যজন বারোমসিয়ার রাম পারগানাইত। তারা এক সাঁওতাল বাহিনী সংগ্রহ করলে পর আমরা নারায়ণপুর লুট করতে গেলাম" [৮১]

(৮০) *গৌরীহর মিত্র — বীরভূমের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯০*

(৮১) *ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস (পরিশিষ্ট ২ — নান্‌কারে সাঁওতালদের ইতিবৃত্ত) পৃঃ ১৫৯-১৬৩*

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে এই অঞ্চলে যতগুলি গ্রাম আক্রমিত হয়েছে একমাত্র মলুটী ছাড়া সব গ্রামেই মহাজনী কারবার ছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের শ্লোগান ছিল — 'মহাজন, আমলা, পুলিশয়েন গজোকানা' অর্থাৎ সুদ কারবারী মহাজন, সরকারী কর্মচারী এবং পুলিশকে হত্যা করো। মলুটী গ্রামের বাবুরা পার্শ্ববর্তী এবং দূরবর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলির জমিদার ছিলেন। জমিদারবাবুরা কখনও শোষণের পথ গ্রহণ করেন নাই বরং আদিবাসী প্রজাদের উপর সদয় ব্যবহারের খ্যাতি নান্‌কার রাজ্যে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই ধারায় বর্তমান ছিল। সম্ভবতঃ মাত্র এই একটি কারণের জন্য মলুটীকে বাদ দিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহীগণ নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামকেই বিধ্বস্থ করে। তবে নান্‌কার তালুকের পক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিণাম সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, কেননা, নান্‌কারের রাজধানী মলুটীকে সেই সময় বাংলা হতে বের করে নিয়ে বিহারের মধ্যে ঢোকানো হয়।

রাজা মেহেরচন্দ্র (১৮৭০-১৯০০) — মেহেরচন্দ্র মলুটীতে নান্‌কারের ষষ্ঠ এবং রাজা উপাধিধারী শেষ জমিদার। রাজা মেহেরচন্দ্রের নাম অন্ততঃ দুটি স্থানে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হল, বেনাগড়িয়া গ্রামের দেশমাঝি ছড়ায় নান্‌কারে সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনা দেবার সময় মেহেরচাঁদকে মলুটীর রাজা বলে উল্লেখ করেছে। অন্যটি মলুটীর পাশের গ্রাম মাসড়ার একটি পুরাতন কাঠি খেলার গানে তাঁর নাম উঠে এসেছে। গানটি এই প্রকার—

"ছিল রাজা মেহেরচাঁদ,
জমিদারী কিসের কাম
ভয় লাগে চাটুজ্যে মশায়কে।
তাদের পানে চাইতে আমার
ছাতি ভরে গেছে"।। [৮২]

চাটুজ্যে মশায় সম্ভবতঃ জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তা ছিলেন। খাজনা আদায়ের জন্য গোমস্তারা প্রজাদের সঙ্গে প্রায়ই কঠোর ব্যবহার করতেন। গানের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তখনকার দিনের লোকগীতিগুলি

(৮২) তথ্যসূত্র — শ্রীদেবীদাস দেবাংশী, মাসড়া।

সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতিকে আধার করে রচিত হত। অধিকাংশ গানের ছন্দে মিল থাকতনা কিন্তু গানের মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখের চিত্রটি আঁকা থাকত সুন্দরভাবে।

অতীতে বীরভূমের গ্রামগুলিতে কাঠি খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল। হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে দশ বারো জন লোক গোল করে ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে গান করত আর একে অপরের লাঠিতে ঠোকাঠুকি করত। গোলাকারের মাঝখানে থাকত একজন মাদল কাঁধে। সে গানের তালে মাদল বাজিয়ে যেত।

মলুটীর মধ্য বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়টা মেহেরচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যেই পড়ে। এই হিসাবে তিনি যে একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন সেটা অনায়াসে বলা যেতেই পারে।

*

ইংরেজ আমল

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসন শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলস্বরূপ তরাই অঞ্চল ও বীরভূমের কিয়দংশ নিয়ে নূতন জেলা সাঁওতাল পরগনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় মলুটী সহ নান্‌কার জমিদারীর এক বৃহৎ অংশ সাঁওতাল পরগনা জেলায় চলে যায় এবং বাকি অংশ বীরভূমেই থেকে যায়।

অনুন্নত সাঁওতাল পরগনা জেলার মধ্যে মলুটীকে স্থাপন করলেও ভারতের যে কোন বিকাশপ্রাপ্ত গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামটির তুলনা করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেখা যায়, ভারতের নব জাগরণের ঢেউ দেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল কিন্তু শহর হতে অনেক দূরে অবস্থিত মলুটীতে সেই ঢেউ অনায়াসেই পৌঁছে গিয়েছিল। গ্রামটিতে শিক্ষার প্রসার, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং রাজনৈতিক চেতনা, ঐ সময় ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে চলছিল।

শিক্ষার প্রসারে নান্‌কারের রাজাগণ বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। রাজা

আনন্দচন্দ্রের সময় হতে রাজাদের আর্থিক সহায়তায় বেশ কয়েকটি টোল এবং চতুস্পাঠি এই গ্রামে পরিচালিত হত। পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপোক্ত ভাবে এই গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি সরকারী সহায়তাও লাভ করে। কাছে-পিঠে, কয়েক মাইলের মধ্যে কোন বিদ্যালয় না থাকায় দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। ঐসব ছাত্রদের থাকায় জন্য ছাত্রাবাসও ছিল। শতাধিক বর্ষের বিদ্যালয়টি আজও আপন মহিমায় মহিয়সী। বিংশ শতকের শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি সাধারণ পাঠাগার। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার উৎসাহ দেবার জন্য পুস্তক পুরস্কার দেওয়া ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক দেওয়ার ব্যবস্থাও এখানে বর্তমান ছিল। যে যুগে কদাচিৎ কোন গ্রামে কেউ বি. এ. পাশ করলে দূরবর্তী গ্রামগুলি হতে গোরুগাড়ী জুড়ে সেই পাশ করা ছাত্রটিকে দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল, সেই যুগে মলুটী গ্রামে বেশ কয়েকটি বি. এ. পাশ এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এম. এ. পাশ ব্যক্তিও বর্তমান ছিলেন।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দিক হতে ঐ সময়টি ছিল মলুটীর স্বর্ণযুগ। ভারতের বিখ্যাত সাধক বামাক্ষেপা মলুটীতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চাকরি সূত্রে এসেছিলেন। তিনি তখন তারাসিদ্ধ হন নাই। জন্মান্তরের সিদ্ধপুরুষ বামদেব প্রায় বছর দেড়েক মলুটীতে থেকে মৌলীক্ষা মায়ের সাধনায় লিপ্ত হয়ে মৌলীক্ষা-সিদ্ধ হয়ে যান। বামাক্ষেপার পথ অনুসরণ করে বহু সাধু তখন মলুটীতে আসতেন। ধুনি জ্বলত মৌলীক্ষাতলায় — ঈশ্বরের নামগান হত সব সময়। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীরাই আসতেন বেশী সংখ্যায়, তবে একজন সমাজসেবী সন্ন্যাসীরও আগমন হয়েছিল মৌলীক্ষা মায়ের স্থানে। সাধুর নাম ছিল সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী, কিন্তু তিনি ইঁটে গোঁসাই নামেই সমধিক পরিচিত।

সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী — এখন হতে পাঁচ দশক আগে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ কিছু লোকের কাছে সুখদানন্দ ব্রহ্মচারীর কর্মকাণ্ডের খোঁজ পাওয়া গেলেও তাঁর পূর্বাশ্রমের বিবরণ বা তিনি কোন্ স্থান হতে মলুটী এসেছিলেন, এসব তত্ত্ব অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তিনি চেহারায় ছিলেন পাতলা এবং ফর্সা, মুখে দাড়ি - পরনে থাকত গেরুয়া বস্ত্র। থাকবার জায়গা ছিল মৌলীক্ষা মায়ের

মন্দির। সুখদানন্দর কৃতিত্ব ছিল বহুমুখী। তিনি নিজে ইঁট কাটতেন। সেইজন্য সম্ভবতঃ লোকে নাম দিয়েছিল ইঁটে গোঁসাই। কাঠের আগুনে পোড়ানো পাতলা ইঁট দিয়ে তিনি মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির ঘিরে পাকা দেওয়াল করে দেন। ভিতরে দুটি বড় ঘর তৈরী করান। একটি মায়ের ভোগঘর ও অন্যটি সাধু-সন্তদের থাকার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। মন্দিরে জলের অভাব দূর করার জন্য একটি কুয়ো খোঁড়ান। ঐ কুয়োর উপরের অংশে পাকা গাঁথনির গায়ে একটি ইঁটে খোদাই করে লেখা ছিল সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী। গ্রামে আটটি দুর্গা ও আটটি কালীর পূজা হয় কিন্তু সেগুলি জমিদারদের ব্যক্তিগত পূজা। সেইজন্য ইঁটে গোঁসাই সকলের জন্য মৌলীক্ষাতলায় একটি সার্বজনীন দুর্গাপূজা ও একটি কালীপূজার প্রবর্তন করেন। দুর্গাপূজার জন্য মলুটীর জমিদারগণ একটি পুকুর সহ কিছু জমি ইঁটে গোঁসাইকে দিয়েছিলেন। তিনি ঐ জমিতে কিছু সব্জীরও চাষ করতেন। মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে গরুর খাবারের জন্য ইঁটের তৈরী দুটি পাতনা এখনও বর্তমান। তবে সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখান মলুটী হতে মল্লারপুর পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটারের একটি রাস্তা তৈরী করে। বারোটি সেতুসহ রাস্তাটি তিনি ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা সম্পূর্ণ করেন। গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী বৃদ্ধ লোকেদের কাছে শোনা গেছে, গেরুয়া পরা সাধুবাবা প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত সমাপ্ত করে রাস্তার কাজে মজদুর লাগিয়ে দিতেন, তারপর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে ফিরে আসতেন সন্ধ্যার আগে এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিতেন। "শ্রমিকদের কাজ দেখাশোনা সহ রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন কাষ্ঠগড়ার এক মুসলমান যুবক। নাম ছিল সাবু সেখ। ঐ যুবক গোঁসাইবাবার কর্মপদ্ধতিতে এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুখদানন্দর মৃত্যুর পর সাবু সেখ গৃহত্যাগ করে সাধু-ফকিরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। বেশ কয়েক বছর পর তাঁর আত্মীয়রা খোঁজ পেয়ে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং বিয়ে দিয়ে সংসারী করে।" [৮৩]

ঐ যুগে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। মলুটী শিক্ষিত লোকের গ্রাম তাই অতি সহজেই তদানীন্তন

---

(৮৩) স্বর্গীয় সাবু সেখের পুত্র শ্রীফিরোজ সেখের কাছে প্রাপ্ত তথ্য।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এই গ্রাম প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। ভারতে সে সময় একমাত্র রাজনৈতিক দল, কংগ্রেসের বহু নেতা সরকারের রোষদৃষ্টি এড়াতে অনেক সময় মলুটীতে আশ্রয় নিতেন। বিপ্লবী দলের সদস্যগণও বহুক্ষেত্রে এখানে আত্মগোপন করে থেকেছেন। বৃটিশশাসিত ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় মলুটী গ্রাম নিঃসন্দেহে একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক তীর্থ ছিল। এই গ্রামের খড়ে-ছাওয়া ঘরে, মাটির মেঝেতে বসে ভারতকে স্বাধীন করার অনেক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল এক সময়।

মলুটী গ্রামের শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম বীরভূম সফরকালে তিনিই মহাত্মাকে সম্বর্ধনা জানান এবং সমগ্র জেলায় ব্যাপক আন্দোলনের রূপরেখা দেখে মহাত্মা অত্যন্ত বিস্মিত হন। শরদিন্দু মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এত অল্প বয়সেই সম্পূর্ণ জেলায় অসহযোগ আন্দোলন চালানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন নাম ভূমিকায়। সেদিনের সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদটি ছিল এই প্রকার —

Death of a devoted Non-Co-operator

Babu Saradindu Chatterjee of Maluty (S.P.) died of congestion in the brain this day at 11a.m. at Rampurhat at the age of 28 years leaving his young wife, aged parents, brothers, sisters, cousins, friends and admirers to mourn his loss. In response to the call of his mother counrty, Saradindu left College in the third year of his B.A. course and took to non-co-operation at a time when the movement was incipient stage. Untill his death he served the country as a non-co-operator in the strictest sense of the term and neither favour nor fear could turn him from the path he chalked out for his life. He was the secretary to the Birbhum District Congress Committee for a considerable time. He was the eloquent speaker and knew no fear. Excessive exercise of his lungs in delivery of speeches on non-co-operation through out the district made him develop Heart disease of serious type and so had to take rest at his home for sometime before his death. In the death of Saradindu the country has sustained an irreparable loss. May his soul rest in peace.[৮৪]

(৮৪) *The Servant, Monday, May 12, 1924.*

তৃতীয় অধ্যায়

মলুটীর মন্দির ভাস্কর্য্য

রাজনগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নান্‌কারের রাজপরিবার যখন মলুটীতে পৌছান তখন এই জায়গা ছিল অরণ্যময়। বন কেটে বসত স্থাপনের পর ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মলুটীকে নান্‌কার তালুকের রাজধানী করা হয়। মলুটীতে আসার পর রাজপরিবারের সদস্যগণ চারটি বাড়ি বা তরফে বিভক্ত হয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতেই ঐ চারটি তরফের মধ্যে মন্দির নির্মাণের একটা প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং মন্দির নির্মাণের সেই গতি শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে, রাজারা নিজেদের বাসের জন্য কোনও দালান-কোঠা তৈরী করাননি অথচ দেব-দেবীর বাসের জন্য ব্যয়বহুল মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন সংখ্যাধিক পরিমাণে। কালের ক্ষয় বুকে নিয়ে বড় বড় মন্দিরগুলি আজও সগর্বে মাথা তুলে দর্শকদের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার রাজাদের প্রধান কীর্তিগুলি ছিল, মন্দির নির্মাণকে প্রাধান্য দেওয়া, দেব-দেবী পূজার বহুধা উপকরণের ব্যবস্থা করা এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মান জ্ঞাপন করা।

পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্টে ভরা মলুটী গ্রাম। গ্রামটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে এখানকার বৈচিত্রময় মন্দির ভাস্কর্য্য। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে শোনা যায়, প্রথম অবস্থায় এই গ্রামে ১০৮টি মন্দির ছিল। তবে, মন্দিরগুলি যখন জীর্ণোদ্ধারের জন্য বিহার সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগকে হস্তান্তরিত করা হয় তখন কেবল ৭২টি মন্দির পাওয়া যায় এবং বিহার সরকার দ্বারা, সংস্কারের জন্য সব মন্দিরকটিই অধিগৃহীত হয়।[৮৫]

"ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্য্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (১) নাগর, (২) বেসর এবং (৩) দ্রাবিড়। নাগরশৈলীতে দেখা যায় মন্দিরগুলি সুউচ্চ হয়ে শিখর সৃষ্টি করে। বেসর এবং

(৮৫) *Govt. of Bihar declared 72 ancient temples of Maluti protected vide gazette No. 1182, Dated 1-12-1983*

দ্রাবিড়শৈলীতে নির্মিত মন্দিরগুলি পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে কেবলমাত্র দ্রাবিড়শৈলীতে নির্মিত মন্দিরগুলিই দেখা যায়।[৮৬]

মলুটীর মন্দিরগুলির গঠনশৈলী ভারতীয় ভাস্কর্য্য রীতিকে নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেছে বলা যাবে না, তবে এখানকার মন্দিরশৈলী মিশ্র প্রকৃতির। সেইজন্য বলা ভাল, মলুটীর মন্দিরগুলি মলুটীর নিজস্ব শৈলীতে নির্মিত।

গঠনশৈলী অনুসারে এখানকার মন্দিরগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় —

১। চালা
২। রেখা
৩। মঞ্চ
৪। একবাংলা
৫। সমতল ছাদ

মলুটীর প্রাচীন ৭২টি মন্দিরের মধ্যে চালা বা শিখর মন্দিরের সংখ্যা- ৫৭, রেখা দেউল - ১, মঞ্চশৈলীতে নির্মিত মন্দির - ১, একবাংলা মন্দির- ১ এবং বাকি - ১২টি সমতল ছাদের সাধারণ মন্দির। গ্রামে চালা মন্দিরের সংখ্যায় সর্বাধিক। "সাধারণতঃ চালা মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালীতে কোন জটিলতা নাই। এই মন্দিরগুলিতে একটিমাত্র কক্ষ থাকে। মন্দিরগুলি চারকোণা প্ল্যাটফর্মের উপর অবস্থিত। প্ল্যাটফর্মের উপর হতে দেওয়ালগুলি খাড়া উপরের দিকে উঠে যায় এবং সেগুলিও চারকোণা। শিখরদেশ অর্ধগোলাকৃতি। চালা মন্দিরগুলির আয়তন ছোট হয়। এরা প্রায়ই নিরাভরণ, কিন্তু কতক ক্ষেত্রে কারুকার্য্যময় হয়ে থাকে"। [৮৭] মলুটীর চালা মন্দির গুলির গঠনশৈলীও উপরোক্ত নিয়মের অন্তর্ভূক্ত। এগুলির গঠন বাংলার চারচালা কুটিরের অনুরূপ। [৮৮] মন্দিরগুলির সামনে আছে একফালি বারান্দা এবং বারান্দায় উঠবার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। "চালা মন্দির স্থাপত্য বিগত মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গঠন প্রণালী হতে দেখা যায়, মন্দিরগুলির ভিতরের উপরিভাগ খিলানের উপর

(৮৬) *G. Santra - Temples of Midnapur, Page 28*
(৮৭) *Ibid, Page 29*
(৮৮) *Plate - I*

রক্ষিত আছে।" [৮৯] এই ধরণের স্থাপত্যশিল্প মুসলমানগণ তাঁদের মাতৃভূমি আরব হতে আমদানি করেছিলেন। "চালা মন্দিরগুলিতে প্রধানতঃ শিবলিঙ্গ স্থাপিত থাকে"। [৯০] মলুটীতে বর্তমান ৫৭টি চালা মন্দিরের মধ্যে ৫১টি চালা মন্দিরে এবং একটি রেখা দেউলে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। একটি চালা মন্দিরে নারায়ণ-শিলার পূজা হয়।

মলুটীর রাজাদের বংশ পরম্পরায় কুলদেবী সিংহবাহিনী দুর্গা এবং রাজপরিবারের সদস্যগণ রাজগুরুর দেওয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কিন্তু গ্রামে দেখা যায় স্বল্পসংখ্যক শক্তিমন্দিরের জায়গায় শিবমন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশী। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে তিনটি। প্রথমটি, শিবমন্দির স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন ধর্মীয় রীতি পালনের প্রয়োজন হয় না। মন্দিরের মুখ যে কোন দিকে রাখা যেতে পারে। রাজপরিবারের অনেক মহিলা, শিবের নামে মন্দির উৎসর্গ করেছেন। এক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বাধার সৃষ্টি হয় নাই। এছাড়া যে কেউ, তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা করতে পারেন। দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে যে, মলুটীর রাজগুরুগণ শিষ্য-পরম্পরায় শৈব মতাবলম্বী। তাঁরা শিবপুরী কাশীতে থাকেন। তাঁদের ঐ শৈব চিন্তাধারার ফলস্বরূপ শিষ্যদিকে অন্য মন্দির অপেক্ষা শিবমন্দির নির্মাণ করার উপদেশ দিয়ে মলুটী গ্রামটিকে কাশীধামের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ করতে চেয়েছিলেন। আর তৃতীয় কারণটি ছিল একেবারেই বাস্তবোচিত। চারটি তরফের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে গ্রামের স্বল্প পরিসরে এতগুলি মন্দির নির্মিত হয়েছে। এমনকি এই প্রতিযোগিতা পরিবারের মধ্যেও বর্তমান ছিল বলে মনে হয়। যেমন পরিবারের বড়বৌ এর নাম দিয়ে একটি মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সেই পরিবারের ছোটবৌ ঐ মন্দিরে পূজো করতে যাবেন না, তাঁর জন্য আবার আলাদা একটি মন্দির তৈরী করাতে হয়েছে। এইভাবে মন্দিরের সংখ্যা বেড়ে কোন সময় তিন অঙ্কে পৌঁছেছিল।

চুন-সুরকি দিয়ে পাতলা ইঁট গেঁথে মলুটীর মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছে। শিবমন্দিরগুলির উচ্চতা সর্বোচ্চ ৬০ ফুট এবং সর্বনিম্ন ১৫ ফুট। এগুলির

(৮৯) *Mc Cutchion David. J - Late Mediaeval Temples of Bengal, Page 5*
(৯০) *G. Santra - Temples of Midnapur, Page 29*

উপরে ত্রিশূলের আকারে বজ্রদণ্ড রয়েছে। প্রবেশপথ অত্যন্ত ছোট। দরজার উচ্চতা চার ফুট থেকে পাঁচ ফুট এবং চওড়া দেড় ফুট মাত্র। সমস্ত শিবমন্দিরগুলিই পারিবারিক দেবস্থল। চওড়া দরজা অপেক্ষা ছোট দরজার দেব-দেউলে মনসংযোগ সহজ হবে সম্ভাবনায় মন্দিরের দরজাগুলিকে ছোট রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছোট দরজায় বাধ্য হয়ে মাথা নীচু করে মন্দিরে ঢুকতে হয়।

মলুটীতে একটি মাত্র রেখা দেউল রয়েছে। যদিও এটি চালা মন্দিরের অন্তর্ভূক্ত, তথাপি গঠনপ্রণালীতে শিখর মন্দিরগুলি হতে কিছুটা পৃথক। মন্দিরটির তলদেশ হতে দরজার উপর পর্য্যন্ত মসৃণ এবং প্রবেশপথের উপর হতে শিখর পর্য্যন্ত খাঁজকাটা। উপরের আমলকটি বেশ বড়। [৯১]

রেখা দেউল উড়িষ্যায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই জন্য সাধারণভাবে ঐ রেখা মন্দিরের গঠনশৈলীকে উড়িষ্যাশৈলীও বলে থাকে। উড়িষ্যা রাজ্য ঝাড়খণ্ড রাজ্য-সংলগ্ন, ফলে এটা স্বাভাবিক যে, মলুটীর মন্দির সমূহের মধ্যে অন্ততঃ একটি রেখা দেউল স্থান করে নিয়েছে। রেখা দেউল সম্বন্ধে ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব বলেন — "এই রেখশৈলীকে উড়িষ্যাশৈলী বলা হয়ে থাকে কিন্তু রেখা মন্দির বাংলার নিজস্ব শৈলী। ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের পূর্ব হতেই এই মন্দিরশৈলী বর্তমান ছিল। এটি মগধ হতে আগত।" [৯২]

মলুটী গ্রামে রাসমঞ্চ মন্দিরের সংখ্যাও একটি। এটি মঞ্চশৈলীতে নির্মিত। [৯৩] মঞ্চশৈলীর মধ্যে আসে তুলসীমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ। "রাসমঞ্চের আয়তন অন্য দুটির চেয়ে বড়। এই মন্দিরের মেঝে উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপিত। অষ্টকোণাকৃতি মন্দির এবং ৮ দিকই খোলা। এর উদ্দেশ্য ভক্তরা যাতে চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন।"[৯৪] রাসমঞ্চ নাম হতে পরিস্কার বোঝা যায় এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা রাধা-কৃষ্ণ কিন্তু মলুটীর রাসমঞ্চ মন্দিরে কালী প্রতিমার পূজা হয়।

(৯১) *Plate - II*

(৯২) *Mc Cutchion David. J - Late Mediaeval Temples of Bengal, 1972*

(৯৩) *Plate - III*

(৯৪) *G. Santra - Temples of Midnapur, Page 33*

একক এক-বাংলা মন্দিরটি রয়েছে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে। মন্দিরের স্থাপত্যকলা বাংলার লোকপ্রিয় এক-বাংলা শৈলীর শ্রেষ্ঠ নমুনা। [৯৫] দোচালা কুটির আকৃতির গঠন। সামনে ছোট বারান্দা। বারান্দার সামনে একটি কক্ষ। এই কক্ষটিই মন্দিরের গর্ভ-গৃহ। মন্দিরে কেবলমাত্র একটি দরজা। ভিতরে আলো প্রবেশের জন্য পরবর্তী সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের দেওয়াল কেটে ছোট জানালা বসানো হয়। দু-চালা ছাদ, খুব ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। মন্দিরের উপর নক্সাকাটা একটি বড় ত্রিশূল রয়েছে। পাতলা ইঁটে তৈরী মন্দিরটি। এটির সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল, কিন্তু সংরক্ষণের প্রয়োজনে বেশ কয়েক বছর আগে সম্পূর্ণ মন্দির সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। ফলে, দু-একটি স্থান ব্যতীত অলঙ্করণগুলি আর দেখা যায় না। গর্ভ-গৃহের ভিতরে একফুট উঁচু বেদীর উপর মৌলীক্ষা মায়ের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। মূর্তি বলতে প্রস্তরনির্মিত একটি বড় আকারের দেবীমস্তকই মৌলীক্ষা মা। প্রতিমা ত্রিনয়নী, মৃদু হাস্যময়ী, প্রশান্ত মুদ্রায় উদ্ভাসিত। অপূর্ব শিল্পকলামণ্ডিত ঐ দেবীমস্তক।

"সমতল ছাদের মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী খুবই সাধারণ। এগুলি আয়তাকার হয় এবং তিনদিক দেওয়াল দিয়ে ঢাকা থাকে। সামনের দিকে চওড়া বেশী হলে ছাদ ধরে রাখার জন্য থামের ব্যবহার করা হয়।" [৯৬] মলুটীতে এই রকম সমতল ছাদের মন্দিরের সংখ্যা — বারো। এই সব মন্দিরে দুর্গা, কালী, নারায়ণ ইত্যাদি দেবী এবং দেবতার পূজা করা হয়। এগুলির মধ্যে একট ভগ্নপ্রায় দুর্গা মন্দিরের উপরিভাগে একসারি মনুষ্যমূর্তি এবং তার উপরে মাঝখানে দুটি পরি ও ছাদের আলিসায় মুখোমুখি দুটি বাঘের মূর্তি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমদানি করা ইংরেজ সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। [৯৭]

গ্রামে ৩০টি চালা মন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটা কারুকার্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত। সাতটি মন্দিরের সম্পূর্ণ অলঙ্কৃত সম্মুখভাগ এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে দেখা যায়। আঠারোটি আংশিক অলঙ্কৃত এবং পাঁচটি অলঙ্কৃত সম্মুখভাগের মধ্যে তিনটি মন্দিরের অনেক ফলক চুরি হয়ে

(৯৫) *Plate - IV*

(৯৬) *G. Santra - Temples of Midnapur, Page 33*

(৯৭) *Plate - V*

গেছে আর অন্য দুটি, আবহাওয়া এবং অযত্নে সম্পূর্ণ নষ্টপ্রায়। চালা মন্দিরের বাকি ২৫টি নিরাভরণ এবং তিনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। তবে নিরাভরণ মন্দিরগুলির মধ্যে রাজার তরফে এক জায়গায় একসঙ্গে তিনটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলির গঠনশৈলী অতি সাধারণ। মোটা ইঁটে তৈরী, কোন অলঙ্করণ নাই কেবল মন্দিরের চূড়া তিনটির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। চূড়াগুলি কতকটা মসজিদ, গীর্জা ও মন্দিরের প্রতীকরূপে নির্মিত হয়েছে। এটি সর্বধর্ম-সমন্বয় চিন্তাধারার সুন্দর প্রকাশ। [৯৮]

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলঙ্করণে মলুটীর মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ সজ্জিত। পোড়ামাটির অঙ্গসজ্জা বহু আগে হতেই বাংলায় প্রচলিত আছে। "মৌর্য্য এবং সুঙ্গ যুগের তৈরী পোড়ামাটির অলঙ্করণেরও সন্ধান পাওয়া যায়।" [৯৯] "বঙ্গদেশ নদীমাতৃক। অতি চিকন পলিমাটি দিয়ে প্রথম দিকে গৃহস্থঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, ছেলে-মেয়েদের খেলনার জন্য নানারকম পুতুল এবং দেবতাদের মূর্তি তৈরী শুরু হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্যকে প্রয়োজনমত স্থায়ী করার জন্য রৌদ্রে শুকিয়ে এবং ভাটিতে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। মধ্যযুগের আগেই মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল ভারতের পূর্বাংশে। পাল রাজাদের সময় আরও বিকশিত হয়। গ্রাম্য কারিগরগণ মাটির তালকে ছাঁচে ফেলে নানারকমের নক্সাকরা অলঙ্করণ তৈরী করতে লাগল মন্দিরসজ্জার উপকরণ হিসাবে। এই কারিগরদিকে বলা হত সূত্রধর। এদের প্রধানকে বলা হত প্রধান স্থপতি। মন্দির তৈরীর ব্যাপারে তাঁরা, মন্দিরের প্ল্যান, ডিজাইন করতেন এবং কাজের বিভাজন করে দিতেন। ফলে বিভিন্ন স্থপতির অধীনে নির্মিত মন্দিরগুলির কারুকার্য্য বিভিন্ন হত। প্যানেলগুলিতে যে সমস্ত কাহিনী, যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা বা মহিষাসুরবধ ইত্যাদির অবতারণা স্থাপতি করেছেন, সেগুলির সঙ্গতি রক্ষা করে টুকরো বা বৃহৎ মাটির কাজ করা ফলকগুলি মন্দিরের প্যানেলে সাজানো হত। মন্দিরে গাঁথা যে সমস্ত সুরম্য দৃশ্য এখনও দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণ হতে উদ্ধৃত কাহিনী। হাতি, ঘোড়া, রথ বা মানুষের আকৃতিও অমিল নয়।" [১০০]

---

(৯৮) Plate - VI

(৯৯) Coomarswamy AK - History of India & Indonesian Art, 1926

(১০০) গোপালদাস মুখোপাধ্যায় ও অজয় কুমার সিন্‌হা — দেবভূমি মলুটী পৃঃ ৮৬-৮৭

রামায়ণের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধই প্রমুখ। অধিকাংশ মন্দিরের প্রবেশপথের উপরেই বিষয়টি স্থান পেয়েছে। উভয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁদের সৈন্যবাহিনী বানর এবং রাক্ষসেরাও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত। বিস্তৃত প্যানেলগুলিতে কুড়িটিরও বেশী মূর্তি দেখা যায়। আবার কতগুলি প্যানেলে কেবল রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধচিত্র রয়েছে।

মলুটীর মন্দিরের প্যানেলগুলিতে রাম-রাবণের একাধিক যুদ্ধচিত্র দর্শকের মনে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। রাবণের পরনে যে বস্ত্র আছে সেটি পরার ঢং বেশ খানিকটা আলাদা। পায়ে রাজা-রাজরার নাগরা জুতো। আবার পায়ের নীচে রয়েছে একটা পিঁড়ি, তার নীচে চারটে চাকা। ঐ চাকাগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে উনি রথে চেপে যুদ্ধ করছেন। তাঁর কুড়ি হাতে নানা অস্ত্র। অন্যদিকে মাথায় ঝুঁটিবাঁধা বনবাসী রাম ও লক্ষ্মণ। হাতে তীর-ধনুক। পিছনে বিভীষণ জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাবণ রথে আর রামচন্দ্র হনুমানের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছেন। [১০১] রাম যুদ্ধক্ষেত্রে চলাফেরা করে যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়েন, তাই রথের অভাবে হনুমান তার প্রভূ রামচন্দ্রকে পিঠে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করছে। রামায়ণে কৃত্তিবাসের ঐ বর্ণনাটা এই রকম —

"রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্বাণ হাতে।
রাবণে মারিতে যান পুরিয়া সন্ধান
হেনকালে জোড়হাতে বলে হনুমান।
রথে চড়ে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে
ভূমেতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে ?
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে মারহ রাবণ।" [১০২]

টেরাকোটা শিল্পের মাধ্যমে রামায়ণের ঐ বর্ণনাটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মলুটীর মন্দির প্যানেলে।

একটি মুখ্য প্যানেলে বড় আকারের ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর এক নিখুঁত মনোরম চিত্র মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষতার ছাপ রেখেছে।

---

(১০১) Plate - VII

(১০২) কৃত্তিবাস ওঝা — রামায়ণ, পৃঃ ২৭২

দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার দুইপাশে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর চিত্র রয়েছে। নীচে রয়েছে মা দুর্গার বাহন সিংহ এবং বর্শাবিদ্ধ অসুর। [১০৩] অলঙ্করণের মধ্যে কার্তিক এবং গণেশের উপস্থিতি দেখা যায় না। রাজার তরফে অন্ততঃ তিনটি মন্দিরের মুখ্য প্যানেলে এইরকম বিশেষ চিত্র ছিল, বহুপূর্বে সেগুলি চুরি হয়ে যায়। শোনা যায় ঐগুলির মধ্যে একটি ছিল কমলে-কামিনীর চিত্র।

মন্দিরের বাঁ পাশের প্যানেল, নীচে হতে উপর পর্যন্ত ছোট ছোট ফলক দিয়ে ক্রমান্বয়ে সাজানো আছে। এই ফলকগুলিতে রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত আছে। এগুলিতে দেখা যায় রামায়ণের অতি পরিচিত চিত্র, রামের বনগমন, সীতাহরণ, [১০৪] জটায়ুবধ, [১০৫] মারীচবধ ইত্যাদি। তেমনি ডানদিকের পার্শ্ব প্যানেলে নীচে হতে উপর পর্যন্ত সাজানো রয়েছে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রগুলি, যেমন যমলার্জুন উদ্ধার, বকাসুরবধ, বস্ত্রহরণ, [১০৬] রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ইত্যাদি। তবে এই ফলকগুলির মধ্যে কৃষ্ণের একটি অপরিচিত চিত্র দেখা যায়। সেটি ষড়ভুজ কৃষ্ণ অর্থাৎ চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণের ছয়টি হাত। তিনি দুই হাতে বাঁশি বাজাচ্ছেন, অন্য দুই হাতে ধনুর্বাণ এবং তৃতীয় দুই হাতে খড়্গ ও শিঙ্গা ধরে আছেন। [১০৭] কৃষ্ণের এই রূপটি বেদ, পুরাণ বা উপনিষদে পাওয়া যায় না, কেননা, একটি ভক্তিগীতকে আধার করে স্থপতি ছবিটি কাগজে এঁকেছেন এবং সূত্রধর সেটিকে টেরাকোটায় রূপ দিয়ে মন্দিরের পার্শ্ব প্যানেলে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ফলকগুলির মধ্যে স্থাপন করেছে। যে গানকে আধার করে এই ফলকটি তৈরী হয়েছে তার প্রথম দুই পংক্তি এইরূপ —

রাম হয়ে ধরো ধনু, কৃষ্ণ হয়ে বাঁশি।
শিব হয়ে ধরো শিঙ্গা মা, কালী হয়ে অসি।।

মন্দিরের মুখ্য প্যানেল ও পার্শ্ব প্যানেল দুটি ছাড়া নীচে রয়েছে নানা রকমের সামাজিক চিত্র। মুসলিম পরবর্তী যুগের প্রাত্যহিক গ্রাম্যজীবনের

(১০৩) *Plate - VIII*
(১০৪) *Plate - IX*
(১০৫) *Plate - X*
(১০৬) *Plate - XI*
(১০৭) *Plate - XII*

একটা সুস্পষ্ট ছবি ঐসব টেরাকোটা দৃশ্যের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায়। যেমন — গোয়ালা গাই দোয়াচ্ছে, গাই বাছুরকে চাটছে, দুটি বলদের কাঁধে জোয়াল চাপানো, পিছনে কিষান হল চালাচ্ছে। এক জায়গায় তেলী, তৈলবীজ পেষাই করছে তার ঘানিতে। আবার একটি ফলকে দেখা যায় হাড়িকাঠে ফেলে ছাগ বলিদানের দৃশ্য। আছে সেতুবন্ধ। বানরগণের মাথায় পাথর এবং গাছের টুকরো চাপিয়ে দিচ্ছে একজন। বানরের দল ঐগুলি মাথায় নিয়ে সারিবদ্ধভাবে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। [১০৮] আর আছে নৌকাবিলাস। বাংলার গ্রামে গ্রামে পটুয়ারা পট দেখাতে এসে নৌকাবিলাস আখ্যানটি শুনিয়ে যায়। আখ্যানটি হচ্ছে, গোপীনিরা যমুনা পার হবে বলে নৌকায় চড়েছে। সেই নৌকার মাঝি হলেন কৃষ্ণ। [১০৯] পটুয়া এই দৃশ্যটির বিবরণ দেয় এইভাবে - 'কৃষ্ণ বলে, সব সখীকে পার করিতে নেব আনা আনা, শ্রীরাধিকা পার করিতে নেব কানের সোনা'। তারপরে অবশ্য পটুয়া ঐ সঙ্গে আর একটি চরিত্র বড়াই বুড়িকে যোগ দিয়ে আখ্যানটি যথেষ্ট বড় করে শোনায়। নীচের প্যানেলের এক দিকে আছে শিকারচিত্র এবং অন্যদিকে আছে চতুরঙ্গ সেনা। চতুরঙ্গ সেনা অর্থাৎ চার প্রকারের সৈন্যবাহিনী যথা — রথ, ঘোড়া, হাতি ও পদাতিক। দু-একটি মন্দিরে শিকারযাত্রার সঙ্গে যুক্ত একটি নূতন চিত্র দেখা যায়। শিকারযাত্রার পিছনে বাবু শিবিকাতে (ছোট পাল্‌কিতে) বসে হুঁকো খাচ্ছেন আর চার বেহারা তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবুর শিবিকার নীচে দৌড়ানোর ভঙ্গীতে একটি কুকুর।[১১০] মলুটী গ্রামের চতুর্দিকে বাংলা এবং ঝাড়খণ্ড উভয় রাজ্যের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসীর বাস। তারা যখন শিকার করতে বেড়োয় কুকুর অবশ্যই সঙ্গে থাকে। সেইজন্য এই ফলকটির মধ্যে আদিবাসী সংস্কৃতির একটি সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

মুখ্য প্যানেলের উপরিভাগে জ্যা আকারে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন মূর্তির ফলক। এগুলি সাধারণতঃ দশাবতার অথবা দশমহাবিদ্যার চিত্র। ছয় তরফের একটি মন্দিরে এই দশ অবতারের ফলকগুলি খুবই স্পষ্ট। মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম ও বুদ্ধ এই নয়

(১০৮) *Plate - XIII*
(১০৯) *Plate - XIV*
(১১০) *Plate - XV*

অবতারের মধ্যে পাঁচ-ছটি অবতারের চিত্র ঐ মন্দিরের মুখ্য প্যানেলের উপরে রয়েছে। পরশুরাম ও বুদ্ধদেবের চিত্রাঙ্কিত ফলক চোখে পড়ে না। আর অনাগত দশম অবতার কল্কীকে মলুটীর মন্দিরে সামিল করা হয় নাই। দুর্গার দশটি রূপ নিয়ে দশমহাবিদ্যা। এদের নাম হল — কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বগলা ও কমলা। এঁদের সকলকে একসঙ্গে স্থান দিতে না পারলেও কোন কোন মন্দিরে একাধিক মহাবিদ্যার স্থান হয়েছে। আবার কোন মন্দিরে মুখ্য প্যানেলের উপর মা দুর্গার পরিবার দেখা যায়। মধ্যস্থলে দুর্গা, একপাশে লক্ষ্মী ও গণেশ এবং অন্যপাশে সরস্বতী ও কার্তিক।

সম্পূর্ণ অলঙ্কৃত মন্দিরের উপরের অংশে দেখা যায় মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। মন্দিরগুলি শিবালয় কিন্তু মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার রূপ ভিন্ন। কোনটিতে রয়েছে কালী, কয়েকটিতে আছে দুর্গা এবং এক জায়গায় রামের চিত্র দেখা যায়।

আরও উপরে মন্দিরের আলিসার নীচে, মন্দির উৎসর্গকারীর নাম, মন্দির নির্মাণের সাল-তারিখ লেখা আছে। ঐ সব অভিলেখগুলি প্রোটো-বাংলা অক্ষরে এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এখানকার মন্দিরে সাল হিসাবে শকাব্দকেই ধরা হয়েছে। সালগুলি আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাইফার বা গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে লেখা আছে। অন্ততঃ এগারোটি মন্দিরে এই রকম অভিলেখ দেখতে পাওয়া যায়।

মলুটীর ৭২টি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন শিবমন্দিরটি মৌলীক্ষাতলায় অবস্থিত। মলুটীতে নান্‌কারের প্রথম রাজা রাখড়চন্দ্র ১৬৪১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করান। এই মন্দিরের অভিলেখটি নিম্নপ্রকার —

ঝক্ষ বাজা বাখড বিত্যসহোদক সশদ্ধা ১৬৪১ কির্ত্তিহৈমবর্তক্ষেবদবো গামন ক্ষখযো বাজচাদ বড্রথাদি এত্তদষজস্তিবেত আক্য মার্গসির্যেন সমাপ্ত মিথুন রাস যৌর্ব্যে পক্ষ *** ***

মার্জিত সম্ভাব্য পাঠ

ব্রাহ্মণ রাজা রাখড় বিত্তসহদোক সশ্রদ্ধা ১৬৪১ কীর্ত্তিহৈমবর্তস্যেব দরো গামন *** যো রাজচাঁদ বড্ররথাদি ত্রয়োদশজস্তিবেত আরভ্য মার্গশীর্ষেণ

সমাপ্ত মিথুনরাস ষোড়শ পক্ষ ***

বাংলায় অর্থ

'ব্রাহ্মণ রাজা রাখড় বিত্ত সহ উদক সশ্রদ্ধ ১৬৪১ শকের কীর্তি শিবের গর্ভগৃহ প্রবেশন ***** যে রাজচাঁদ বিশাল রথাদি ত্রয়োদশ জ্যৈষ্ঠ হতে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ মাসে সমাপ্ত। আষাঢ় মাস কৃষ্ণা প্রতিপদ'।

মন্দিরের অভিলেখ অনুসারে হিসাব করে ঐ স্থাপনার দিনটি নিশ্চিত করা যায় ২১শে আষাঢ়, ১১২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার বলে।

অষ্টাদশ শতকে নির্মিত দ্বিতীয় মন্দিরটি রয়েছে ছয় তরফে। মন্দিরের অভিলেখে আছে —

"শ্রীশ্রী কালী স্বহায়। শ্রীমৎ গোকুলচন্দ্রস্য মাতু শ্রীমতী ঘৃতবতী দেবী শ্রীশ্রী শিব স্থাপনা। স্বাশীদচকাঃব্দা ১৬৯১ ** ৪০১ ** ১১ **"

বঙ্গার্থ — 'শ্রীমান গোকুলচন্দ্রের মাতা শ্রীমতী ঘৃতবতী দেবী ১৬৯১ শকাব্দে শ্রীশ্রীশিব স্থাপন করেন'। ১৬৯১ শকাব্দকে বঙ্গাব্দ করলে ১১৭৬ সাল হয়। শেষের ইঁটে ১১ লেখা আছে, তার পরের ইঁটটা নাই। থাকলে ওটিতে লেখা থাকত ৭৬। খ্রীষ্টাব্দে হবে - ১৭৬৯।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ মন্দিরটি রাজার বাড়িতে দেখা যায়। এই মন্দিরের অভিলেখে নির্মাণের সময়টি গুপ্ত সংকেতে রাখা হয়েছে। এই অভিলেখটিতে যা লেখা রয়েছে —

"শ্রীগণেশায়। শাকে যুগ্মাঙ্ক কাল ক্ষিতি পারগণিতে শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়স্যা *** ধরস্য দ্বিজকুলতিলকস্যাবনী পালকস্য মাতা নারায়ণী *** নিজগুরুচরণ ধ্যাননিষ্ঠা শিবস্য প্রাসাদ শম্ভু পাদাম্বুজ গলিত সুধাপান মুগ্ধা চকার ***"

এখানে শাকে অর্থাৎ শকাব্দে, যুগ্মাঙ্ক = ২২ কাল ৭, ক্ষিতি - ১ = ২২৭১ কিন্তু ২২৭১ শকাব্দ আসতে অনেক দেরী। সেক্ষেত্রে যদি সংখ্যাগুলি উল্টে দেওয়া যায় তাহলে দাঁড়ায় ১৭২২ শকাব্দ। খ্রীষ্টাব্দে হবে ১৮০০।

অভিলেখটির বঙ্গার্থ — 'দ্বিজকুল তিলক অবনীপালক শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়ের মাতা নিজগুরুচরণ ধ্যান নিরতা শম্ভু পাদাম্বুজ হতে ক্ষরিত সুধাপান

মোহিতা নারায়ণী শিবের প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন'। ১৭২২ শকে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়।

অন্য কয়েকটি মন্দিরে সালগুলি গুপ্ত সংকেতের মধ্যে রাখলেও শেষের পংক্তিতে সাল - তারিখ - বার সবগুলিকেই প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। ছয় তরফের এক মন্দিরে একটি লেখা ঐ রকমের —

*"শ্রীদুর্গা শাকে চন্দ্র শরো নগ শশিমিতে বিশে মৃগেন্দ্রহয়ণ বারে দৈত্যেগুরৌ তিথৌ কীর্তিমিতি শ্রীবিশ্বনাথায় *** ইষ্টময়ং হৃতপ্রঃ বিবিধং শ্রীবিচিত্রং *** *** ৬। মাঘ ভবাব্ধে তারক শ্রীবিশ্বনাথ প্রভু। সন ১২৩৬ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র শকাব্দা ১৭৫১ সতেরেশো একানেতৌ। শুক্রবার শুক্লপক্ষ। সমাপ্তিখৌ"॥*

শাকে = শকাব্দে, চন্দ্র - ১, শর - ৫ (পঞ্চশর), নগ - ৭, শশি - ১ = ১৫৭১, এটি উল্টে দিলে ১৭৫১ শকাব্দ হবে মন্দির নির্মাণের সময়।
বঙ্গার্থ — '১৭৫১ শকাব্দের ২০শে ভাদ্র দৈত্যগুরু তিথিতে (শুক্রবার) কীর্তি শ্রীবিশ্বনাথের জন্য *** *** স্থাপনা *** ৬ মাঘ ভবসাগর হতে তারক শ্রীবিশ্বনাথ প্রভু, সন ১২৩৬ সাল তারিখ ২০শে ভাদ্র, শকাব্দ ১৭৫১, শুক্রবার শুক্লপক্ষ। সমাপ্তি *** ।' ১৭৫১ শকাব্দ = ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ।

রাজার বাড়ির একটি মন্দিরে ঐ ধরনের লেখাটি হচ্ছে নিম্নরূপ —

*"শ্রীশ্রী দুর্গা। শাকে খাষ্টৌ দধি চন্দ্র পরিমাণে চ অব্দ পোষে মাসি সিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং শনৈশ্চরো। ভবাব্ধৌ ত্রাণ হেত্বার্থং কৃতং সৌধং ভবায়বে বিশ্বেশ্বর্য্যা *** দেব্যা অতি যত্নে দাকিনা। সন ১২৬৫ সাল"।*

শাকে = শকাব্দে, খ - ০, অষ্ট - ৮, উদধি - ৭, চন্দ্র - ১ = ০৮৭১, একে উল্টে দিলে ১৭৮০ শকাব্দ হয়। বাংলা ১২৬৫ সাল, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজার বাড়ির ঐ মন্দিরটি তৈরী হয়।

বঙ্গার্থ — 'পৌষ মাস, শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী শনিবার, ভবসাগর হতে ত্রাণ হেতু কৃত সৌধ ভবকে (শিবকে) বিশ্বেশ্বরী দেবী অতিযত্নে অর্পণ করিলেন।'

মন্দিরের লেখাগুলি মলুটীর নান্‌কার রাজাদের রাজত্বকাল এবং নান্‌কার রাজ্যের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় দেয়। পণ্ডিতদের কাছে মন্দিরের অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে এই অভিলেখগুলিই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু। *

টেরাকোটা অলঙ্করণ দ্বারা মলুটীর মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত টেরাকোটাগুলি এত উচ্চমানের যে, প্রথম নজরে এগুলিকে পাথর বলে মনে হবে। পুরাতত্ব বিশেষজ্ঞ শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয়ও মলুটীর টেরাকোটা কারুকার্য্যকে ফুলপাথরের অলঙ্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন — "বীরভূম জেলার মধ্যে ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত যেসব মন্দির দেখা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যার মন্দির হল গণপুর ও মল্লারপুরে। .... তদুপরি রামপুরহাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে, পশ্চিমবাংলার সীমান্তে অবস্থিত বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত মলুটী গ্রামে প্রাচীন বাঙ্গালী ভূস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় পঞ্চাশটি ছোটো-বড়ো বাংলারীতির মন্দিরও এই উপাদানে অলংকৃত। এক্ষেত্রে 'টেরাকোটায়' উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর মত ফুলপাথরেও খোদিত হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান ইত্যাদি।"[১১১]

উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মলুটীর মন্দির-অলঙ্করণের ভেঙ্গে পড়ে থাকা একটি টুকরো পরীক্ষার জন্য Central glass and Ceramic Research Institute, Jadavpur, Kolkata'য় পাঠানো হয়। সেটি পরীক্ষার পর নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পাওয়া যায় —

"The sample contains red clay and brownish black and reddish brown ferruginous materials. These ferruginous materials are

---

** শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মলুটীর বিভিন্ন মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন।*

(১১১) তারাপদ সাঁতরা — পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, পৃঃ ৭১

lineonite and goethite. Concentric banding of goethite are found to occur within red clay . Irregular brownish black small ferruginous materials are scattered within the clay materials. Very few fine silica are found to occur within red clay." *

পরীক্ষায় এটিকে বারবার লাল মাটি বলা হয়েছে। এই গ্রামের সর্বত্র তিন-চার ফুট নীচে মোরাম মাটির স্তর। মন্দিরের স্থাপতিগণ স্থানীয়ভাবে টেরাকোটা নক্সাগুলি তৈরী ও ভাটিতে পোড়ানোর ব্যবস্থা করতেন। মোরাম মাটি হতে প্রস্তুত টেরাকোটা নক্সার রং সম্ভবতঃ ল্যাটেরাইট বা ফুলপাথরের রঙের মত হয়ে থাকতে পারে। সাঁতরা মহাশয় মলুটীতে প্রায় পঞ্চাশটি অলঙ্কৃত মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখানে প্রথম হতেই তিরিশটির বেশী অলঙ্কৃত মন্দির নাই। সেইজন্য মনে হয় উনি হয়তো নিজে এই গ্রামে আসেন নাই, কারোও কাছে শুনে মলুটীর মন্দির সম্বন্ধে লিখে থাকবেন।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ছাড়া সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় প্রতি বছর পূর্বদিকে বৃষ্টির ছাঁট লেগে টেরাকোটা অলঙ্কৃত পূর্বমুখী মন্দিরগুলির নীচে প্রায় পাঁচ ফুট অংশে সম্পূর্ণ নোনা লেগে গেছে। মাটির হাঁড়িতে লবণ রাখলে হাঁড়ির যা অবস্থা হয়, অলঙ্করণগুলির অবস্থাও সেইরূপ হয়েছে। আরও উপরে, কিছু অংশে মূর্তিগুলিও অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

এই বাস্তব পরিস্থিতিগুলি সামনে রেখে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মলুটীর মন্দিরগুলি টেরাকোটা অলঙ্করণেই সুসজ্জিত হয়ে আছে।

প্রস্তরযুগের অস্ত্রের সন্ধান

মলুটী গ্রামের দক্ষিণ দিকের শেষ সীমায় চিলা বা চন্দন ঘাট নালা নামে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। এখান হতে ১৬ কিমি উত্তরে বাঁশপাহাড়ী হতে বেড়িয়ে, নীচের দিকে আরও ১৬ কিমি গিয়ে তারাপীঠে দ্বারকা নদীতে পড়েছে। মলুটী সংলগ্ন চিলা নদীর স্থানটিকে বলা হয় সদরঘাট। সদরঘাটের উভয় দিকে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে নদীতটে

** শ্রীমতী কেকা মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, অলঙ্কৃত টুকরোটি পরীক্ষা করিয়ে দিয়েছেন।*

প্রাচীন প্রস্তরযুগের অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুব্রত চক্রবর্তী বলেন — "বীরভূমে প্রস্তরযুগের সাংস্কৃতিক সূচনা এবং এর ব্যাপ্তির নিদর্শন এখনও পর্যন্ত স্বল্প পরিসরেই সীমিত। মূলতঃ উত্তর-পশ্চিম বীরভূমের চিলা নালার ধারে মলুটী সদরঘাট থেকে এই সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মলুটী সদরঘাট প্রত্নস্থলের অবস্থান ২৪°৭' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৭°৪০' পূর্ব দ্রাঘিমায়। মলুটীর সদরঘাট প্রত্নস্থল হতে একিওলিও (Acheulian) সংস্কৃতির যে নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি হল কুড়ুল (Hand axe), ঘসবার যন্ত্র (Scrapper), ব্লেড ইত্যাদি।

এখানে একিওলিও সংস্কৃতির আরও যে হাল্কা আয়ুধ পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে আছে উন্নত প্রকারের ব্লেড (Retouched Blade), পাশে ও শেষে ধারযুক্ত ঘসবার যন্ত্র (Side and end Scrappers) এবং ছিদ্র করার যন্ত্র (Borer)।" [১১২]

এখানকার নদীতটে প্রাপ্ত লঘু অস্ত্রগুলি মধ্য প্রস্তরযুগে নির্মিত বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। এখানে বড় অস্ত্র বা তীর অথবা বর্শায় লাগানো ছুঁড়ে মারার অস্ত্রের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

মলুটী গ্রামের ভিতর মধ্যযুগীন পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। ঐ সঙ্গে গ্রামের একপ্রান্তে পাওয়া যাচ্ছে প্রস্তর যুগের লোকেদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র এবং তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ছোট-ছোট যন্ত্র। [১১৩] ভাবতেও অবাক লাগে যে, কয়েক হাজার বছর আগের মানুষ এখানে বাস করত এবং আজকের প্রাপ্ত অস্ত্র ও যন্ত্রগুলি তারা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করত। এমনিতেই মলুটী একটি পুরাতাত্ত্বিক গ্রাম। তার সঙ্গে প্রস্তরযুগের অস্ত্রপ্রাপ্তি যুক্ত হয়ে, গ্রামটির পুরাতাত্ত্বিক মহত্ত্ব অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে।

(১১২) বীরভূমি বীরভূম (প্রথম পর্ব) — সম্পাদনা শ্রীবরুণ রায়, পৃঃ ১২১-১২২

(১১৩) Plate - XVI

মলুটীর দেব-দেবী ও লোকসংস্কৃতি

মলুটী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাধিক দেবতা এবং দেবালয় দেখে যে কোন লোকের পক্ষে অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, এই স্থান কোন এক সময় যথেষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে ধর্মের একটা প্লাবন এখানে বয়ে গেছে। বর্তমানে সেই প্লাবনের প্রচণ্ডতা কমে গেলেও তার ক্ষীণ ধারাটি প্রবাহমান আছে গ্রামের বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-পার্বণের মধ্যে।

একদিকে যেমন দুর্গা, কালী, মৌলীক্ষা, নারায়ণ, শিব ইত্যাদি বৈদিক দেবতাগুলির পূজা বংশানুক্রমে চলে আসছে, অন্যদিকে তেমনি মনসা বা ধর্মরাজের পূজার ন্যায় লৌকিক দেবতাদের পূজাগুলিও পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে সার্বজনীন স্তরে এগিয়ে আসছে। এইজন্য এই গ্রামে বৈদিক এবং লৌকিক দেবতার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়ের রূপটি লক্ষ্য করার মত। এছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি বারোয়ারী পূজাগুলিও সমধিক উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। বরং এগুলির সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

পুরাতন বীরভূম জেলা রাঢ়ভূমির কেন্দ্রস্থল। যুগ যুগ ধরে তন্ত্র সাধনা এখানে প্রচলিত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখাও তন্ত্র ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ঐসব বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বীরভূমের জঙ্গলময় পশ্চিমাঞ্চলে, মলুটী, তারাপীঠ, ডাবুক ইত্যাদি স্থানে তাঁদের তন্ত্রসাধনা চালিয়ে যান। কোনও এক অতীতকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের তন্ত্রসাধনার প্রধান উপকরণ হিসাবে মলুটীতে অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরা স্থাপিত হয়েছিলেন। পরে তিনি সিংহবাহিনী দুর্গারূপে পূজিতা হন, নামকরণ হয় মৌলীক্ষা।

মৌলীক্ষাদেবী — মৌলি অর্থাৎ মস্তক এবং ঈক্ষা অর্থে দর্শন। এই দুইটি শব্দের যোগে মৌলীক্ষা শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবিকভাবে মৌলীক্ষা মায়ের সম্পূর্ণ অবয়ব নাই। কেবলমাত্র অপরূপ, লাবণ্যময়ী এক দেবীমস্তক মন্দিরের বেদীতে দেখতে পাওয়া যায় । [১১৪] ল্যাটেরাইট পাথরকে ছেনি

(১১৪) *Plate - XVII*

দিয়ে সুন্দরভাবে কেটে এই মূর্তিটি তৈরী করা হয়েছে। পিছনের দেওয়ালের সঙ্গে স্থায়ীভাবে এই দেবীমস্তকের পিছন অংশ গাঁথা রয়েছে। এই দেবীর একমাত্র মৌলি বা মস্তকটিই দেখা যায়, এইজন্য এঁর নাম মৌলীক্ষা। ইনি মলুটীর রাজবংশের কুলদেবী সিংহবাহিনী দুর্গা। মৌলীক্ষা মাকে রাজপরিবারের লোকেরা সিংহবাহিনী দুর্গারূপে পূজা করে আসছেন সেই প্রথম হতে। তবে মৌলীক্ষার মূর্তির সঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার কোনও মিল দেখা যায় না, সেইজন্য মনে হয় মৌলীক্ষা মাকে সিংহবাহিনীরূপে পূজা করার ব্যবস্থাটি স্থানীয়ভাবেই করা হয়েছিল।

মৌলীক্ষা মায়ের সম্ভাব্য ইতিহাস

অতীতে বীরভূমের পশ্চিমপ্রান্ত সম্পূর্ণ অরণ্যময় ছিল। সেই সময় এই অঞ্চলটি বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবাধীন ছিল। জঙ্গলের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ ছোট মন্দির তৈরী করে, তার ভিতর তাঁদের উপাস্যা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে গোপনে সাধন-ভজন করতেন। অনেক গ্রামে বৌদ্ধদের দেব-দেবীর প্রস্তর-প্রতিমা আজও দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য বলেন — "বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাব বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এইসব জায়গায় বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেব-দেবীর মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। [১১৫] এইদিক হতে দেখতে গেলে মৌলীক্ষা মাকে বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত দেবী বলেই ধারণা করা যায়। বজ্রযানী বৌদ্ধদের পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরার উল্লেখ আছে। মৌলীক্ষার মূর্তির সঙ্গে পাণ্ডরার বেশ কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ গুহ্য সমাজতন্ত্রে ধ্যানীবুদ্ধদের সৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনা পাওয়া যায়। এঁরা আদিবুদ্ধ বা বজ্রধর হতে উৎপন্ন। সাধনমালায় পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের নাম - বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের পৃথক নামে এক বা একাধিক শক্তি রয়েছে। যথা —

বৈরোচন — শক্তি - লোচনা মতান্তরে মামকী, গাত্রবর্ণ সাদা, বাহন নাগ,

(১১৫) *বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য - বৌদ্ধদের দেব-দেবী, পৃঃ ২৬*

প্রতীক শ্বেতচক্র।

রত্নসম্ভব — শক্তি - বজ্রধাত্বীশ্বরী মতান্তরে তারা, গাত্রবর্ণ হলুদ, বাহন সিংহ, প্রতীক রত্ন, দক্ষিণমুখী।

অমিতাভ — শক্তি - পাণ্ডরা, গাত্রবর্ণ লাল, বাহন ময়ূর, প্রতীক পদ্ম, পশ্চিমমুখী।

অমোঘসিদ্ধি — শক্তি - তারা মতান্তরে বজ্রধাত্বীশ্বরী, গাত্রবর্ণ সবুজ, বাহন গরুড়, প্রতীক বিশ্বচক্র, উত্তরমুখী।

অক্ষোভ্য — শক্তি - মানসিক মতান্তরে লোচনা, গাত্রবর্ণ নীল, বাহন হাতি, প্রতীক বজ্র, পূর্বমুখী।

প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের কুল পৃথক। এক্ষেত্রে ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ কুলের শক্তি পাণ্ডরার বর্ণনার সঙ্গে মৌলীক্ষা মায়ের মূর্তির নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। গাত্র বর্ণ লাল, পশ্চিমমুখে অবস্থান এবং পিছনে প্রতীক হিসাবে পদ্মের উপস্থিতি। স্ত্রী দেবতার চেহারা দেখা যায় মৌলীক্ষা-মূর্তির মধ্যে, সেইজন্য অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরাকেই বর্তমান মৌলীক্ষা মায়ের প্রাথমিক রূপ বলে ধরা যেতে পারে।

নান্‌কারের রাজারা মলুটীকে রাজধানী করার অনেক আগেই ঐসব বজ্রযানী বৌদ্ধরা এই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। রাজারা মলুটীতে রাজধানী স্থাপনের পর বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত মন্দির ও মূর্তি সংস্কার করান। পাণ্ডরাকে রাজবংশের কুলদেবী সিংহবাহিনীরূপে তখন হতেই পূজা শুরু হয়।

মৌলীক্ষা মায়ের নিত্যপূজা, ভোগ ও আরতি ছাড়া আশ্বিনের শুক্লা চতুর্দশী ও চৈত্র মাসের হোমের সময় মহাপূজা হয়। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে মায়ের মহোৎসব হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের লোক মৌলীক্ষা মাকে খুব জাগ্রত বলে বিশ্বাস করে। কোন শুভকাজ শুরু করার আগে মৌলীক্ষা মায়ের পূজা দিয়ে তাঁর আশীষ কামনা করা এই গ্রামের লোকেদের চিরন্তন প্রথা। মায়ের পূজা ও দর্শনের জন্য প্রতিদিন বাইরে হতে বহু ভক্তের আগমন হয় মন্দিরে।

দুর্গাপূজা — রাজাদের বংশপরম্পরায় গ্রামে আটটি দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। এই আটটি পূজায় প্রতিমা হয় না। নবপত্রিকার সামনে ঘট স্থাপন

করে পূজা হয়ে আসছে। জনশ্রুতি আছে যে, এখন হতে আড়াইশো বছর আগে রাজা আনন্দচন্দ্র সাড়ম্বরে দুর্গামূর্তি তৈরী করিয়ে রাজসিকভাবে পূজো করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু ঐ বছরই মহাসপ্তমীর দিন তাঁর এক পুত্রের মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত রাজা দুর্গামূর্তিকে নদীতে বিসর্জন দেবার নির্দেশ দেন। বেহারাগণ প্রতিমাকে জলে না ফেলে নদীর ধারে রেখে চলে আসে। মাসড়া গ্রামের কিছু প্রজা ঐ প্রতিমা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের গ্রামে স্থাপন ক'রে, বাকি পূজা সমাপ্ত করে। ঐ প্রতিমাকে মাসড়ার শিবতলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিই মাসড়ার আদি দুর্গাপূজা। বহুদিন পর্য্যন্ত মলুটীর রাজাদের নাম সংকল্প করে শিবতলা দুর্গার পূজো হত। এদিকে, সেই সময় হতেই রাজারা মলুটীতে মূর্তি তৈরী করিয়ে পূজার প্রথা বন্ধ করে দেন। তবে অন্যান্য আড়ম্বর অব্যাহত থাকে।

বৎসরান্তে চার দিনের জন্য উমার পিত্রালয়ে আগমন যেমন বাংলার অন্যান্য পল্লীতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে দেয়, এই গ্রামও তার ব্যতিরেক নয়। যথেষ্ট আনন্দ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানানো হয় দুর্গাপূজাকে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে আগের আড়ম্বর অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে তথাপি ইদানীং কালেও দুর্গাপূজাতে প্রচুর ব্যয় করা হয় এবং যথেষ্ট সংখ্যায় অজা, মেষ, মহিষ ইত্যাদির বলিদান প্রচলিত আছে। গ্রামে একটি মাত্র গড়া প্রতিমার পূজো হয়। এখন হতে একশো বছর আগে সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী এই সার্বজনীন দুর্গাপূজার সূত্রপাত করেছিলেন।

শ্যামাপূজা — শাক্তভূমি রাঢ়ে শক্তিপূজার অনুষ্ঠান নিরবছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে কোন আদিম যুগ হতে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করলেও, তন্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব স্পর্শ করেছিল অহিংসা- মৌলিক বৌদ্ধধর্মের উপরেও। এখানকার রাজারা ছিলেন শক্তিমন্ত্রে বিশ্বাসী। তন্ত্রোক্ত ভাবধারায় কালীপূজার সৃষ্টি করে গেছেন এখানকার সাধক রাজারা। তন্ত্রে শক্তির প্রাধান্য। কালীপূজা, শক্তিপূজাগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে শিব শয়ান, নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন। তাঁর উপর নৃত্যপরা প্রকৃতিই কালী।

মলুটীতে অনান্য পূজার চেয়ে শ্যামাপূজার বিকাশ অত্যন্ত প্রকট।

পূজা বলতে অন্যত্র দুর্গাপূজাকেই বোঝায় কিন্তু এখানে কার্ত্তিক মাসের দক্ষিণা কালীর পূজাকেই নির্দিষ্ট করে। মলুটীর শ্যামাপূজার আড়ম্বর বহুদূর বিদিত। এখানে আটটি কালীমূর্তির পূজো হয়। এখানকার রাজারা যখন পূর্বতন রাজধানী বীরভূম জেলার ডামরা গ্রাম হতে এসে মলুটীতে রাজধানী পত্তন করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আনেন রাজ-পূজিতা শ্যামা। সেই শ্যামা সংখ্যায় একটিই ছিল। পরবর্তী কালে একক রাজা হতে বংশানুক্রমে অনেক অংশীদারের সৃষ্টি হলে শ্যামাপূজাও আটটিতে দাঁড়ায়। এখানকার আটটি দুর্গাপূজার সৃষ্টিও অনুরূপ ভাবে হয়েছে। প্রথম যে শ্যামা প্রতিমাকে ডামরা হতে মলুটী আনা হয়েছিল সেটিকে আদিকালী বলা হয়। ঐ কালী মন্দিরের পাশে তখন লোকালয় ছিলনা বরং শ্মশান ছিল। আদিকালী হতেই বাকি সাতটি কালী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চমুণ্ডীর বেদীতে আদিকালীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ পঞ্চমুণ্ডী বেদীটি ছাড়া আরও দুই-তিনটি কালীর বেদী পঞ্চমুণ্ডের সমাহারে তৈরী বলে শোনা যায়। মলুটীর আটটি কালীস্থানই আপন বৈশিষ্টে ভরা। কোনটিতে সাধনা-সিদ্ধি, কোথাও কামনা-সিদ্ধি. কোথাও আবার ধর্ণা-সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে।

পূজা একদিনের কিন্তু তার বিপুল আয়োজন শুরু হয় কয়েক দিন আগে হতেই। গ্রামবাসী যাঁরা কর্মসূত্রে বা অন্য কারণে গ্রামের বাইরে বাস করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ঐ একদিনের জন্যও গ্রামে ফেরেন। আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে যায় প্রতিঘর। শুধু মলুটীতেই নয় পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রামগুলিও মলুটীর কালীপূজা উপলক্ষ্যে আত্মীয়-কুটুম্বে উপচে পড়ে। এছাড়া, বহিরাগত উৎসুক লোকেদের ভীড় বেড়ে যায়। অন্ততঃ গ্রামের দুই জায়গায় দিন সাতেকের জন্য ছোট-খাটো মেলাও বসে।

অন্ধকার অমানিশা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জেনারেটারের আলোতে। এখানকার প্রথা অনুযায়ী কালীমায়ের পূজার আগে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাদ্য সহকারে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মৌলীক্ষা মায়ের পূজা দিতে যায়। এই প্রথাটি এখানে 'এয়োজা' নামে পরিচিত। পূজার পর মৌলীক্ষা মন্দিরের বাইরে দীর্ঘসময় ধরে আতশবাজি পোড়ানো হয়। কয়েক হাজার দর্শকের সমাবেশ হয় ওখানে। পল্লীগ্রামে এত আড়ম্বরের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের আতশবাজি জ্বালিয়ে মনোরঞ্জন ব্যবস্থা খুব কম জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

মহানিশার পূজান্তে পশুবলি শুরু হয় এবং এই ক্রিয়া অনেক বেলা পর্যন্ত চলতে থাকে। মধ্যে কয়েক ঘণ্টা বিরতির পর বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। চারপাশে সাঁওতাল আদিবাসীদের গ্রাম। দলে দলে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী ভীড় করতে শুরু করে মৌলীক্ষা মন্দিরের দক্ষিণে বিশাল প্রান্তরে। কালী প্রতিমাগুলিকে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর ঐ প্রান্তরে নিয়ে আসা হয়। একটি লম্বা বেদীর উপর পর পর বসানো হয় প্রতিমাগুলিকে। মলুটীর মূর্তিগুলি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রাম হতে আগত কালী প্রতিমাকেও ঐ বেদীতে বসানো হয়। তারপর শোভাযাত্রা করে প্রতিমাগুলিকে মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। স্থানীয় লোকেরা ঐ প্রদক্ষিণ-ক্রিয়াকে 'কালীমায়ের বাচ খেলা' বলে থাকে। নদীতে নৌকার যে বাইচ হয় তারই অনুকরণে এই 'বাচ' শব্দটির উৎপত্তি বলে মনে হয়। এর পর নির্দিষ্ট পুস্করিণীগুলিতে প্রতিমার বিসর্জন হয়।

মনসাপূজা — লৌকিক দেব-দেবীদের পূজাগুলির মধ্যে মনসাপূজা গ্রাম্যসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। গ্রীষ্মের শুরু হতে শীতের আগমন পর্যন্ত সমগ্র পূর্বভারতে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। মনসা সাপের দেবতা। তাঁকে সন্তুষ্ট করলে সর্পদংশনের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়, এই ধারণা বহুকালের।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রামের মত বাঙ্গালী অধ্যুষিত মলুটী গ্রামেও মনসাপূজা অত্যন্ত উৎসাহ এবং আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। এই গ্রামে মনসাপূজাগুলির সংখ্যা ছয়। সাধারণতঃ বাগতি ও বাউড়ি শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই মনসাপূজা সীমাবদ্ধ। তারাই এ পূজার উদ্যোক্তা এবং তারাই সেবাইত। তবে অন্য বর্ণের লোকেরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনসার পূজা দেয় এবং বারি আনা বা ডিঙে ফেরানোর সময় শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানকে সার্বজনীন রূপ দিয়ে থাকে।

ঢাকের বাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রা করে মনসার 'বারি' অর্থাৎ পূর্ণঘট আনা হয়। ঘট আনবার সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ সমস্বরে মা মনসার প্রশস্তি গেয়ে চলে। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'চিয়েন গাওয়া'। বারি আনতে যাওয়ার সময় চিয়েন গানের শুরুটা এমনি —

'মাকে আনতে চলো ভাই দীঘি সরোবর
কি আনন্দ হলো মায়ের তিপিনি নগর।।
মাকে আনতে চলো ভাই'

এবার পূর্ণঘট মাথায় নিয়ে পুকুর হতে মন্দিরের দিকে আসে উপোসী ভক্তের দল। সামনে থাকে ঢাক ও কাঁসি আর পিছনে আসে স্ত্রী-পুরুষের একটা দল। তবে মহিলারাই এখানে মুখ্য ভূমিকায় থাকে। বারি ভরে ফিরে আসার সময় গান শোনা যায় —

'তোরা দেখ্‌গো দাঁড়ায়ে মা মনসার বারি এল
লহরী খেলিয়ে'।

কোথাও আবার রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্ক চলে ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে। একে বলে 'বোল-কাটাকাটি'। একপক্ষ থেকে একজন গলা উঁচু করে বলল —

'থান বন্ধন, সেবা বন্ধন, বন্ধন বসুমতী,
এপার ওপার ঘাট বন্ধন, দেবী সরস্বতী।
ওঠরে নাগিনীর বিষ, গড়ুরের সহায়
নাই বিষ তো নাই, মা মনসার দয়।।'

অন্যপক্ষ থেকে তার প্রতিবাদী আরও উঁচু গলায় তার জবাব দিল —

'ওরে, মা মনসা দাঁড়িয়ে আছে, গলে ফুলের মালা,
শঙ্খের ভিতরে বিষ, করিছেন খেলা।
নাম্‌রে নাগিনীর বিষ, গড়ুরের সহায়
নাই বিষ তো নাই, মা মনসার দয়।'

পূজো বলিদানের পর গ্রামের রাস্তায় ডিঙে ফেরানোর পালা। কাঠের ছোট নৌকায় চাকা লাগানো। রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙার অনুকরণে এই ডিঙা ফেরানো ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে বলে মনে হয়। এই সময়ে যে গান গাওয়া হয় সেটি এই রকম —

'কাঁচের ভরণে মনসা জয় জয় করে
লালজবা, পুষ্প জবা দিব তরে তরে'। *

** মলুটী গ্রামের শ্রীআস্তিক ঘোষ এবং শ্রীস্বপন দাস মহাশয়দ্বয়ের নিকট হতে মলুটীর মনসাপূজার চিয়েন গানগুলি সংগৃহীত।*

এই গানটির অপভ্রংশ শব্দগুলির প্রকৃতরূপ এই প্রকার —

'কাঞ্চন বরণী মনসা জ্বল জ্বল করে
লাল জবা, পুষ্প জবা দিব স্তরে স্তরে।'

পাঁজি-পুঁথি দেখে নিয়ম অনুসারে মনসাপূজা ছাড়া মাঝে মাঝে কাঁধে মনসা নিয়ে গ্রামে আসে মনসা মায়ের কোনও দেবাংশী। ঘরে ঘরে মনসার আশীর্বাদ দিয়ে, হাতের কাঁসিটা বাজিয়ে খানিকটা মনসা মাহাত্ম্য গেয়ে শোনায়। কালীনাগ লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করার জন্য লোহার বাসরঘরের দিকে যাচ্ছে। এই রকম বর্ণনা রয়েছে দেবাংশীর একটি গানে —

"ধিয়েনেতে ছিলেন, মায়ের আসন টলিল
কালী কালী বলে মাগো চিনু ডাক দিল।
চলিতে চলিতে কালীলাগ চলিতে লাগিল
নিছুনি নগরে গিয়ে দেখিবারে পেলো
উর্দ্ধবাহু হয়ে লাগ, নাচিতে লাগিল।
গন্ধবেনের ছেলে হয়ে দণ্ডে মারে লাথি
বাসরে সেঁধিয়ে লাগ না পোহাল রাতি।
বৃক্ষলতা যত আছো, আর যত পক্ষী
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, তোমরা থেকো সাক্ষী"।। *

মলুটীতে কেবল বাগতি ও বাউড়িদের মধ্যেই মনসাপূজা প্রচলিত থাকলেও একটি কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, মলুটীর ছয় তরফের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি মনসাদেবী নিকটস্থ কাষ্ঠগড়া গ্রামে এখনও বর্তমান। ছয় তরফের জমিদার পরিবারের ছেলেদের বিয়ে ও পৈতের আগে, কাষ্ঠগড়া গ্রামে গিয়ে ঐ মনসাদেবীর পূজা এবং পাঁঠা বলিদান দেওয়া অবশ্যকরণীয় হয়ে আছে।

মনসাপূজা এবং তার চিয়েন গানগুলি এই গ্রামের লোকসংস্কৃতিতে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

** সিয়াটা — মঙ্গলপুর নিবাসী শ্রীনন্দু দেবাংশী মহাশয়ের নিকট হতে গানটি সংগ্রহ করা হয়েছে।*

ধর্মরাজ পূজা — ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর হিন্দুসমাজের আর এক লৌকিক দেবতা। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যেও ধর্মরাজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গ্রামের চাষীরা আখ পেষাই করে গুড় তোলার সময় গুড় তৈরীর জন্য বড় উনুনের পাশে একটি পাথরকে পুঁতে ধর্মরাজ বলে চিহ্নিত করে। গুড় উঠলে সর্বপ্রথম ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। বাত-বেদনা ভাল করার জন্য ডাক্তার কবিরাজ অপেক্ষা ধর্মরাজতলার মাটির প্রলেপ এই গ্রামে অধিক পরিচিত। মূর্তিহীন ধর্মরাজের প্রতীক হিসাবে একখণ্ড পাথরে সিঁদুর লেপে পূজা করা হয়। মাটির ঘোড়া মানৎ করা হয় ধর্মরাজকে। হাঁস, মুরগি বলিদান দেওয়া হয় কোথাও কোথাও। তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মরাজ পূজার ধারাটি চলে আসছে এই গ্রামে তবে গ্রামের মধ্যে একটি ছোট মন্দিরে এইরকম একটি ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত করে থাকেন। এই গ্রামে ধর্মরাজ পূজার সংখ্যা চার।

এই চারটি ধর্মরাজ পূজা ছাড়া গ্রামের দক্ষিণে চিলা নদীর অপর দিকে, বীরভূমের সীমানায় ধর্মরাজের একটি থান আছে। এটির পূজো মলুটীর পুরোহিতরাই করেন। ধর্মরাজের বেদীর চতুর্দিকে পাথরের স্তূপ। যাওয়া আসার পথে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে দিয়ে প্রণাম করার প্রথা বহুকাল হতে চলে আসছে। বীরভূমের অনেক জায়গায় এইসব দেবতাকে ব্রহ্মদৈত্য, ঢেলাইচণ্ডী বা পাথরবুড়ি আখ্যা দেওয়া হয়। এখানে ইনি ধর্মরাজ বলেই পরিচিত। গ্রামে ঢোকার আগে ধর্মরাজ বা পাথরবুড়িকে ঢিল উপহার দেওয়া সম্বন্ধে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটি হল — "প্রাচীন কালে পাশাপাশি গ্রামে বিয়ে-কুটুম হত ছেলে-মেয়েদের। কিন্তু এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম যেতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পার হতে হত। তাই বয়স্ক লোকেরা জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে লাঠি ছাড়া বাড়ির বাইরে যেত না। ঢেলা-পাথরের টুকরো হাতে ছেলেদের মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফেলে দেওয়া ঐ সব পাথরের নুড়িতে স্তূপাকার স্থানে পাথরবুড়ির থান হয়েছিল। এখন এইসব কৌতুককর কথা মানুষ বিশ্বাস করবেনা, তবে এখনও পাথর বুড়িকে এক

লৌকিক দেবী বলে গ্রাম্যসমাজে অনেকেই মানে"[১১৬] মলুটী গ্রাম্য সমাজে ধর্মরাজকে লোকদেবতারূপে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করা হয়। সব বর্ণের লোকেরাই এতে অংশ নেয়।

ভাদুনাচ — ভাদ্রমাসে ভাদুনাচ। গানের সঙ্গে নাচে, মেয়ে সেজে থাকা একটি ছেলে। কোলে থাকে দেড়ফুট লম্বা একটা মাটির পুতুল। ঐ পুতুলটিই ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু। ভাদুও একটি লোকদেবী। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনার অনেক স্থানে ভাদুপূজো প্রচলিত আছে। সারা ভাদ্রমাস ভদ্রেশ্বরীর পূজা হয় এবং মাসের শেষদিনে ভাদুকে বিসর্জন করা হয়। মলুটী গ্রামে ভাদুপূজার প্রচলন নাই, কিন্তু ভাদুনামীয় পুতুলকে কোলে নিয়ে ভাদ্রমাসে সারা গ্রামে গান ও নাচের মাধ্যমে ভাদুকে সকলের আপন করে দেওয়া হয়। ভাদু সম্বন্ধে সংগৃহীত কাহিনীটি এই প্রকার —

বহু আগে পুরুলিয়ায় এক রাজার কন্যা ছিলেন ভদ্রেশ্বরী। রূপে-গুণে অতুলনীয়া। ব্যবহারও ছিল মায়ের মত। সেই ভদ্রেশ্বরী অকালে মারা গেলে প্রজারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তাঁরই স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই ভাদুপূজার সৃষ্টি। কুমারী ভাদুর মাটির মূর্তি তৈরী করে বিভিন্ন গ্রামে নাচ ও গানের মাধ্যমে তাঁর গুণকীর্তন করা, ভাদুর স্মৃতিরক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। ভাদুগানের দু এক কলি শুনেই বোঝা যায় ভাদু জনসাধারণের কত প্রিয় —

'ভাদু আমার ছুট্টু ছেলে, কে পাঠালো কলকাতা ?
কলকাতার ঐ নোনাজলে ভাদু হল শ্যামলতা।'

ভাদু কলকাতা হতে ফিরে এসেছে। সকলে আনন্দিত —

'ভাদু নামল দেশে, চরণ মুছবো মাথার কেশে,
ভাদু নামল দেশে'।

আবার আদর করে ভাদুর চুলবাঁধার বর্ণনা দিয়েছে অন্য একটি গানে —

'ভাদু রাজার বিটি, উল্টোতালে ফ্যাসান করে বেঁধেছে ঝুঁটি'।

প্রতি ভাদ্রমাসে মলুটী গ্রামে ভাদু নাচের এই দৃশ্য অতি পরিচিত।

---

(১১৬) পশ্চিমবঙ্গ ২০০৬, বীরভূম জেলা সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৩

পটের গান — গ্রামে আসে পটুয়া। পট অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যমে ঘটনাকে দৃশ্যমান করা হয়। চিত্রটির অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য সঙ্গে থাকে গান। নানা রকমের পট — রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় লোকগাথা, রামায়ণে বর্ণিত অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনি বধ বা চৌরাশি নরককুণ্ডে পাপীদের শাস্তি সম্বন্ধীয় চিত্র ও গাথা ইত্যাদি। চৌরাশি নরকের চিত্র এবং নরকে বিভিন্ন পাপের শাস্তির দৃশ্য দেখাবার সঙ্গে রামায়ণে দেওয়া বর্ণনাটি পটুয়া সুর করে শোনায় —

"রহিয়াছে দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিংবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা।।
অন্ধকার চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড।।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে।।" [১১৭]

মাঝে মাঝেই পাশের জেলা হতে পটুয়ারা এই গ্রামে এসে তাদের পট দেখিয়ে ও গান শুনিয়ে যায়। এতবার দেখা, এতবার শোনা তবুও পটের গান চিরনূতন। পটুয়ার গান শোনার জন্য প্রতিবারই ভীড় করে গ্রামের লোকেরা। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনে লোককাহিনীগুলি।

পৌষ আগলানো — গ্রাম্যসমাজে পৌষ মাসকে লক্ষ্মীমাস বলা হয়। এই সময় মাঠের পাকা ধান গৃহস্থের ঘরে পৌঁছে যায়। গ্রামে চলে নানা পূজা-পার্বণ আর পিঠে-পুলি খাওয়ার ধুম। শীতের আমেজে পরিবেশ থাকে মনোরম। সেইজন্য পৌষ মাসকে যেতে দিতে মন সায় দেয় না। মলুটী গ্রামে পৌষ মাসকে আগলে রাখার একটা সংস্কৃতি রয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির আগের সন্ধ্যায় খড় দিয়ে ছোট ছোট দড়ি পাকিয়ে প্রত্যেকটি ঘরে, চালের বাতায়, এমনকি বাক্সো-পেটিরার উপরেও রেখে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় চাঁউরি-বাঁউরির বন্ধন। মনে হয় ঘরে বত্রিশ বন্ধন দিয়ে পৌষ মাসের, ঘর হতে পালাবার রাস্তাটি বন্ধ করা হয়। এরপর সদর দরজার বাইরে রাস্তার উপর চালগুঁড়ির আল্পনার উপরে গোবরের ছোট ছোট গুলি

(১১৭) কৃত্তিবাস ওঝা - রামায়ণ, পৃঃ ৩৪৪

রেখে বাড়ির মেয়েরা একত্রে বসে পৌষমাসকে চলে না যাবার জন্য প্রার্থনা করে —

"এসো পৌষ, যেওনাকো, না যেও ছাড়িয়ে,
ছেলে পিলেয় ভাত খাবে, কোটোরা ভরিয়ে।
এসো পৌষ, যেওনাকো জন্ম-জন্ম এখানে থাকো,
পৌষ বারোমাস, পৌষ বারোমাস।"

গ্রামের গরীব লোকেদের পেটভরে একবাটি ভাত খাবার বড়ই আকাঙ্খা। পৌষ মাসে মা লক্ষ্মী সকলের জন্য পেটভরা ভাতের যোগার করে দেন। তাই পৌষ মাসকে প্রার্থনা জানানো হয় যেন বারোমাসই এখানে পৌষ মাস হয়ে থাকে।

কালাসাহেব — মলুটী নান্‌কার তালুকে পুরাতন একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল। এখনও নান্‌কার তালুকের বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক ব্যক্তিদের মুখে এই প্রবাদবাক্যটি শোনা যায়। প্রবাদবাক্যটি হচ্ছে — 'কালা, নীলা, মৌলীক্ষা এই তিনে নান্‌কার রক্ষা'। প্রবাদটির অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নান্‌কার রাজ্যের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে এই তিনজনকে। প্রথম রক্ষাকর্ত্রী নান্‌কারের রাজাদের কুলদেবী মৌলীক্ষা মা। তিনি মলুটীতেই অবস্থান করছেন। আর নীলা হচ্ছেন নীলকণ্ঠ শিব। কাঠগড়া গ্রামের এক প্রান্তে তাঁর মন্দির অবস্থিত। তিনি নান্‌কার তালুক রক্ষা করার দ্বিতীয় দেবতা। তৃতীয় এবং শেষ রক্ষাকর্তা হলেন কালা অর্থাৎ কালাসাহেব। কাঠগড়া গ্রামের উত্তরপ্রান্তে কিছুটা দূরে কালাসাহেবের মাজার (সমাধি স্থল)। কালাসাহেব ছিলেন প্রভূত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর। কালাসাহেবের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের পারিবারিক সূত্রে তাঁর সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে সেটা হল — কালাসাহেবের আসল নাম খাজা আক্তার সাহেব। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় (১৮৫৫) তিনি যুবক ছিলেন। ঐ সময়ে মলুটীর রাজা ছিলেন ঈশানচন্দ্র। রাজা ঈশানচন্দ্রের সমসাময়িক তাঁর খুড়তুতো ভাই তারিণীপ্রসাদ রায়ের পত্নী কাশীশ্বরী দেবী পাঁচশো বিঘা লাখেরাজ জমি কালাসাহেবকে দান করেন। কাশীশ্বরী দেবী কালাসাহেবের মধ্যে নিশ্চয় কিছু চমৎকারিত্ব দেখে থাকবেন, নইলে অতখানি নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি

তাঁকে দান করবেন কেন ? কালাসাহেব যখন জীবিত ছিলেন সেই সময়ের তাঁর কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা কোন চমৎকারিত্বের বিবরণ জানা যায় না, তবে মৃত্যুর পর তাঁর মাজারে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ স্থানীয় লোকেদের কাছে শুনতে পাওয়া যায়। যেমন অনেকে দেখেছে গভীর রাত্রে ঘোড়ার পিঠে চেপে পীরসাহেব বেড়াচ্ছেন। মাজার পার হবার সময় খালিপায়ে হেঁটে, মাজারে সেলাম জানিয়ে গেলে কর্মসিদ্ধি হয়। এর বিপরীত, যদি গাড়ি-ঘোড়া হতে না নেমে অহমিকার সঙ্গে মাজার পার হয় তবে নিশ্চিতরূপে দুর্ঘটনা ঘটে। অনেকে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার পূজোর পর কালার দয়ায় বোবারও কথা ফুটেছিল আর মাজারের পুকুরে স্নান করে, বাবার পূজো দিয়ে পঙ্গুও ভাল হয়। কালাসাহেব কৃপা করলে কর্মে সিদ্ধি ও মনস্কামনা পূর্ণ হয়। *

বৈশাখ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার কালাসাহেবের মৃত্যুদিনে তাঁর মাজারে মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোকেই মাজারে পূজো দেয়। কালাসাহেবকে মাটির ঘোড়া দিয়ে মানৎ করে। আবার দুটো নূতন ঘোড়া দিয়ে মাজার থেকে একটা পুরোনো ঘোড়া এনে গোয়ালঘরে টাঙিয়ে রাখলে ঐ গোয়ালের গরুর এঁটুলি হয় না।

কালাসাহেবকে নিস্কর ভূমিদান ছাড়াও মলুটীর রাজাদের উদার মনোবৃত্তির আরও পরিচয় পাওয়া যায়। কাষ্ঠগড়া মসজিদের খরচ চালানোর জন্য একটি নিস্কর পুস্করিণী দান করেছিলেন তাঁরা।

** কাষ্ঠগড়া গ্রামের সৈয়দ আলি দেওয়ান ও হাকিম দেওয়ান মহাশয়দ্বয়ের কাছে প্রাপ্ত তথ্যসূত্র।*

সিদ্ধপীঠ মলুটী

নান্‌কারের রাজধানী মলুটীতে অবস্থিত মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির তন্ত্রসাধনার উপযুক্ত একটি পীঠ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে বহুকাল হতেই। পুরাণোক্ত পীঠস্থান বলতে সাধারণতঃ বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছিন্ন সতীর দেহাংশ পতনের স্থানগুলিকেই বোঝায় এবং এগুলি সংখ্যায় একান্নোটি। যথা —

'যাভির্বিনা ন সিদ্ধন্তি জপসাধন তৎক্রিয়াঃ
পঞ্চাশদেক পীঠানি এবং ভৈরবদেবতাঃ
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণুচক্র ক্ষতেন চ
মমানব পুযো দেবহিতায় ত্বয়ি কথ্যতে'।
— শিব-পার্বতী সংবাদ

তবে ভারতের এই পীঠস্থানগুলিতে লোকের অবাধ গমনাগমনের ফলে তান্ত্রিকরা সেখানে তাঁদের সাধনার গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারতেন না। ফলে তন্ত্রশাস্ত্রে উদ্ভূত হল পীঠের নূতন সংজ্ঞা। পুরাণোক্ত একান্নো পীঠ ছাড়াও সিদ্ধপীঠের সংজ্ঞা রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে —

'জাতো লক্ষবলি যত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ।
মহাবিদ্যা জপঃ কোটি সিদ্ধপীঠ প্রকীর্তিতঃ'॥
— ইতি তন্ত্রম্ ।

যে স্থলে লক্ষ বলি, কোটিসংখ্যক হোম এবং কোটি পরিমাণে মহাবিদ্যা জপ করা হয়েছে, তাকেই সিদ্ধপীঠ বলা হয়।

রাঢ়ভূমিতে তান্ত্রিক সাধক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের কয়েকটি এই অর্থে সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়। বীরভূমের তারাপীঠ এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা জেলার মলুটী এই পর্য্যায়ের সিদ্ধপীঠ।

যে সময়ে কৌল সন্ন্যাসী এবং বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের তন্ত্র সাধনা ব্যাপকরূপে প্রচলিত ছিল সেই সময় মলুটী সহ বীরভূমের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ । সাধারণ লোকের যাতায়াতের অসুবিধার

সুযোগ নিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ মলুটীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট মন্দির তৈরী করান এবং তার ভিতর স্থাপন করেন তাঁদের উপাস্যা দেবী ধ্যনীবুদ্ধ অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরাকে। এই মন্দিরকে তাঁরা, তাঁদের সাধনার অন্যতম উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। মলুটী, নান্‌কারের রাজধানী হওয়ার পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উপাস্যা দেবী পাণ্ডরা, নান্‌কারের রাজাদের কুলদেবীরূপে, মৌলীক্ষা নামে রূপান্তরিত হন।

নিকটস্থ তারাপীঠের ন্যায় প্রচারিত সিদ্ধপীঠ না হলেও একাধিক সাধক এখানে তন্ত্রসাধনা করে গেছেন। আক্ষরিক অর্থে মৌলীক্ষা মায়ের স্থানও সিদ্ধপীঠ। বহুদিন ধরে বহু বলি হয়েছে মন্দিরের সামনে যূপকাষ্ঠে এবং হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে সংখ্যাতীতবার। মন্দির অলিন্দে সিদ্ধাসন করে অনেক সাধক মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ করেছেন অগণিত সংখ্যায়।

এখানে আগত সাধকদের স্রোতধারায় বিশিষ্ট সাধক মহাযোগী বামদেব তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ করবার অনেক আগেই মলুটীতে এসেছিলেন। সাধকের আসনে মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ করে মৌলীক্ষা-সিদ্ধ হয়ে এগিয়ে যান বশিষ্ঠ-আরাধিতা তারার বেদীতলে।

তারাপীঠে তিনি তারা মা আর মলুটীতে মা মৌলীক্ষা, সেই একই বিশ্বজননী বিরাজমানা উভয়স্থানে কিন্তু দুটি জায়গায় রূপ তাঁর ভিন্ন। তারাপীঠে তিনি উগ্রতারা-রৌদ্ররসে রুদ্রাণী। মলুটীতে তিনিই আবার মৌলীক্ষা শান্তরূপে উদাসীনি। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি বিভিন্নরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণা।

চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ঈশ্বর-মহাত্মাযুক্ত স্থান আকর্ষণ করে উচ্চকোটির সাধকবর্গকে। যাঁর আধার তাঁর দেওয়ায় পূর্ণ, তিনিই মধুময় পার্থিব রজঃ খুঁজে পান তাঁর অধিষ্ঠানে। তাই আমরা দেখি, তাঁর অনুভূতির আকাঙ্খায় মুমুক্ষু সাধকদের তীর্থ পরিক্রমা। এই মলুটী তীর্থে, মৌলীক্ষা মায়ের বেদীতলে, অনেকে তাঁদের হৃদয়ের ভক্তিটুকু উজাড় করে দিয়ে সেই আনন্দঘন সুরটি খুঁজে পেয়েছেন।

যে মৌলীক্ষা মাকে মলুটীর রাজাগণ তাঁদের কুলদেবী সিংহবাহিনী রূপে পূজা শুরু করেছিলেন, সময়ের আনুকূল্যে এবং সাধু ও সিদ্ধ সাধকগণের একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির অর্ঘ্যে সেই ভুবনমোহিনী মা সুপ্তির

ঘোর কাটিয়ে জাগ্রতা হলেন। পাষাণ মূর্তিতে হল প্রাণের সঞ্চার। মায়ের মূর্তি এবং মন্দির চত্বর ভরে উঠল নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে।

তারা মায়ের খাড়া পনেরো কিলোমিটার পশ্চিমে এক সমান্তরালেই মৌলীক্ষা মাতা প্রতিষ্ঠিতা। মন্দিরের পরিবেশ ভাবগম্ভীর। দিন-দুপুরেই মন্দির প্রাঙ্গণ ঢুকতে গা ছম ছম করে - আর রাত্রিতে কথাই নাই। মায়ের অধিষ্ঠান অস্বাভাবিক রহস্যময় হয়ে ওঠে। মনে হয় ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত অতি সুক্ষ্ম পরমাত্মা ঐ সময় সেখানে অনেকখানি ঘনীভূত হয়ে থাকে। একাধিক লোক মন্দিরের অলৌকিক অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে, সেগুলির সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নপ্রকার —

অবাঞ্ছিত তান্ত্রিক

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন বাংলার সাধকদের অন্যতম। তাঁরই বংশে জন্ম আশুতোষের। তিনিও তান্ত্রিক। তিনি ছিলেন মলুটী গ্রামের চাটুজ্যে পরিবারের গুরু। সেই সুবাদে তাঁর মলুটী আসা-যাওয়া ছিল। সাধক কমলাকান্ত তাঁর তন্ত্রসাধনা করেছিলেন তারাপীঠে। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর তন্ত্রসাধনা শুরু করেন। গভীর রাত্রিতে তিনি মন্দিরে যেতেন। মড়ার মাথার খুলিতে থাকত কারণবারি। বাঁ হাতে করে ওটি তুলে মাঝে মাঝে চুমুক দিতেন আর ডান হাতে থাকত মড়া মানুষের হাড় থেকে তৈরী জপের মালা। কয়েক রাত্রি ভালভাবেই পার হল, তারপর একরাত্রে তাঁকে মন্দিরের বাইরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। জপের মালা ছিল মন্দির প্রাঙ্গণের একটি জবাগাছের ডালে আর কারণপাত্রটি মন্দির হতে অন্ততঃ পঞ্চাশ মিটার দূরে পড়েছিল। ঐ ঘটনার পর আশুতোষ আর মলুটী আসেন নাই। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন মহামায়া মৌলীক্ষা মায়ের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত।

অবাঞ্ছিত সিদ্ধাই

কলকাতার এক নীলাম্বর বাবু মৌলীক্ষা মায়ের জপ তপ ও কাছে থেকে সাধনাকে গভীর করার জন্য মন্দিরের প্রবেশপথের পাশেই

এক কোঠাবাড়ি তৈরী করিয়ে বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর বাসস্থান পরিত্যাগ করে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন একমাত্র মৌলীক্ষা মা ও ঐ নীলাম্বর বাবুই জানেন।

কিছুদিন পর পরিত্যক্ত ঐ বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিলেন নেপালী বাবা নামে এক সিদ্ধাই-সাধু। নেপালীবাবার সপরিবারে কয়েকদিনের জন্য অন্যত্র কোথাও যাওয়ার ছিল। ঘরের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন গ্রামের দুই বন্ধুকে। ঐ বাড়িতে থাকার সময় বন্ধুদ্বয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। মধ্যরাত্রিতে ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে ছপাৎ-ছপাৎ করে ঝাড়ু মারার শব্দ উঠত। ওরা নেমে এসে কাউকেই দেখতে পেত না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আবার সেই শব্দ উঠত। বন্ধু দুজন দুইরাত্রির বেশী ঐ ঘরে থাকতে পারে নাই।

বছর দুয়েকের মধ্যে নেপালীবাবার পরিবারের সকলেই মরে-হেঁজে শেষ হয়ে গেল। নীলাম্বর বাবুর মত নেপালীবাবাও একদিন গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন, তাঁর কেউ সন্ধান পায় নাই। কালক্রমে দোতলা কোঠাবাড়ি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে সমতল হয়ে গেল। তাই মনে হয়, মৌলীক্ষা মায়ের নির্জন লীলাক্ষেত্রের মধ্যে নীলাম্বর বাবু ও নেপালীবাবা মহামায়ার কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

হোমকুণ্ড জ্বলে ওঠা

ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে এক বৈশাখ মাসের সন্ধ্যার পর, হরিনাম সংকীর্ত্তনের একটি দল গ্রাম প্রদক্ষিণের পর মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরে নাম সংকীর্ত্তন করার জন্য পশ্চিম দিকের দরজায় উপস্থিত হয়। ঐ সময় তারা দেখে নির্বাপিত হোমকুণ্ড হতে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে। সাহস করে মন্দির চত্বরে ঢুকে হোমকুণ্ড পরীক্ষা করে সেখানে কোনপ্রকার জ্বালানীর অবশেষ দেখতে পাওয়া যায় নাই।

নির্জন মন্দিরে ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ

হোমকুণ্ড জ্বলে ওঠার মত অন্য এক বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গ্রামের এক ভক্তিমতী বৃদ্ধা মহিলার। মহিলাটি ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রত্যহ মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরের দরজায় ও বারান্দায় জলের ছড়া দিতে আসত। সে রাত্রি ছিল কাক-জ্যোৎস্নায় ভরা। ফলে সময়

ঠিক করে উঠতে পারে নাই বৃদ্ধা। রাত থাকতেই মায়ের মন্দিরে চলে এসেছে। অভ্যাসমত বারান্দায় ছড়া দিচ্ছে এমন সময় উত্তর দিক হতে ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ এল। কে ঝাড়ু দিচ্ছে দেখবার জন্য মহিলা ওদিকে যেতেই দক্ষিণ দিক হতে ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ উঠল। উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে যেতে, মহিলা শুনতে পেল মন্দিরের পিছন হতে অর্থাৎ পূর্ব দিক হতে ঐ রকম শব্দ উঠছে। বিভ্রান্ত মহিলা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, ততক্ষণে তার আগে, পিছনে ও দুইপাশে একসঙ্গে ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ উঠতে লাগল। মন্দিরে লোক নাই অথচ এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে দেখে মহিলা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কোনও রকমে মন্দিরের বাইরে এসে বাড়ির দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে দেখে ঘড়িতে তখন বাজছে দুটো তিরিশ মিনিট।

মন্দিরে শেয়ালের হঠাৎ আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান

মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরে সব গেটগুলো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোথা হতে এক মস্ত বড় শেয়ালের আবির্ভাব, আবার চোখের সামনেই সেটির অন্তর্ধান বেশ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। এই শেয়াল সম্বন্ধীয় ঘটনা সব মিলিয়ে অন্ততঃ তিনবার ঘটেছে।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি ঘটে। পরের দিন পৌষ সংক্রান্তি, মৌলীক্ষা মায়ের মহোৎসব। আগের রাতে মন্দিরের বাইরে রান্না চলছে। দলের মধ্যে একজন কর্মী, দেবীচরণ বাবুর হঠাৎ ইচ্ছে হল, মায়ের মন্দিরে গিয়ে খানিকটা জপ-তপ করে আসবেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। এত রাতে মন্দিরে ঢুকতে সকলেই তাকে মানা করল। দেবীচরণ বাবু ছিলেন একজন অসমসাহসী পুরুষ কারোও মানা না শুনে মায়ের মন্দিরের বারান্দায় জপ করতে চলে গেলেন। কিন্তু কতক্ষণ ? পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চিৎকার করে উঠলেন দেবীবাবু। ছুটে বেড়িয়ে এলেন রান্নার জায়গায়। পৌষ মাসের রাত্রেও ঘেমে গেছেন তিনি। বললেন — "জপের শুরুতেই এক বিরাট শেয়াল সামনে এসে হাজির হল। তার চোখদুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছিল আর আমাকে যেন খেতে আসছিল, সকলে আলো নিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে সেই শেয়ালের কোন হদিশ করতে পারে নাই।

দ্বিতীয়বার শেয়াল সম্বন্ধীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরের সামনে রাস্তার অপরদিকে ছিল বিহার পুরাতত্ত্ব বিভাগের ক্যাম্প। মাইকেল মারাণ্ডী ও বিশু বাস্কী পুরাতত্ত্ব বিভাগের দুজন গার্ড, জোৎস্না আলোতে দেখল মন্দিরের বাইরে একটা শেয়াল ঘোরাফেরা করছে। একহাতে টর্চ ও অন্যহাতে লাঠি নিয়ে দুজনেই শেয়ালটাকে তাড়া করতে ওরা দেখল ওটি আর বাইরে নাই, মন্দির চত্বরে চলে গিয়েছে। মন্দির পরিসরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করেও ওরা শেয়ালটাকে দেখতে পেলনা। এবার তাদের চিন্তায় এল মন্দিরের সব গেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শেয়ালটা ভিতরে কি করে প্রবেশ করল ? এখানেই শেষ নয়। পরের দিন হতে ঐ দুজন আদিবাসী যুবকের ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। আদিবাসী প্রথামত কবিরাজী ও পরে ডাক্তারী চিকিৎসা করেও ব্যথা কমল না। গ্রামের একজন বৃদ্ধব্যক্তি সব কথা শুনে ওদিকে মৌলীক্ষা মায়ের পূজো দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে উপদেশ দিল। উপদেশমত কাজ করার পর মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে তাদের ব্যথার উপশম হয়।

তৃতীয়বার ঘটনাটি ঘটে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের শিবচতুর্দশীর রাত্রে। সে বার দেখেছিলেন কলকাতার এক ভদ্রমহিলা, নাম দেবযানী। তিনি সম্ভবতঃ বিশেষ কোন কামনা নিয়ে আগের দুই অমাবস্যায় মৌলীক্ষা মাকে পূজো দিয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বার একদিন আগেই অর্থাৎ শিবচতুর্দশীর দিন মলুটী পৌঁছে যান। সে রাত্রিটায় শিবরাত্রির যোগ থাকার জন্য মন্দিরে থেকে রাত্রের চারপ্রহরে শিবের মাথায় জল ঢালার ঈচ্ছাও করেছিলেন তিনি। সে রাত্রি কিন্তু মন্দির নির্জন ছিল না। গ্রামের কয়েকজন যুবক শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য মন্দিরের পিছনে হ্যাসাগ জেলে শুয়ে-বসে ছিল। ভদ্রমহিলা শিবমন্দিরের বারান্দায় বসেছিলেন। হ্যাসাগের আলোতে মন্দিরের সামনেটা হাল্কা ভাবে আলোকিত ছিল। তিনি হঠাৎ দেখলেন মায়ের মন্দিরের সামনে বাঁধানো চাতালে মস্তবড় এক শেয়াল দাঁড়িয়ে। কোথা হতে ওটি এল তিনি একেবারেই বুঝতে পারলেন না। ফলে অত্যন্ত ভীত হয়ে শিবমন্দিরের ভিতরে ঢুকতে গেলেন কিন্তু পরক্ষণেই শেয়ালটাকে আর দেখতে পেলেন না। তিনি সর্বক্ষণ জন্তুটির উপর নজর রেখেছিলেন কিন্তু শেয়ালটি কিভাবে এল এবং চোখের সামনে ভোজবাজির মত অদৃশ্য

হয়ে গেল চিন্তা করে ভয়ে শিউরে উঠলেন। মন্দিরের পিছনে শুয়ে থাকা ছেলেগুলোকে ডেকে তিনি ঘটনাটা বললেন। এর পর সকলে মিলে শেয়ালটার খোঁজ করেও সেটির আর দেখা পাওয়া গেল না।

বহুরূপে দেবী দুর্গার অবস্থিতি। পুরাণে বর্ণিত আছে তিনি একসময় শিবারূপও ধারণ করেছিলেন। সে কাহিনী হল, বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করে যমুনা পার হবেন। যমুনায় অথৈ জল। মহামায়া দুর্গা সেদিন শিবারূপ ধারণ করে, যমুনা পার হয়ে পথ দেখিয়েছিলেন কৃষ্ণপিতা বসুদেবকে —

"যমুনা ছাড়িল পথ বসুদেব যায়।
শৃগালরূপেতে মায়া সে পথ দেখায়"।

— শ্রীমদ্‌ভাগবত, দশমস্কন্ধ।

কলকাতার ঐ ভদ্রমহিলার কামনাপূর্তি হয়েছিল কিনা জানা যায় নাই, কেননা তিনি পুনরায় মৌলীক্ষা মায়ের দর্শনে আসেন নাই। তবে গভীর রাত্রে মন্দিরে শিবাদর্শনের অর্থ মায়ের কাছে রাত্রির ঐ বিশেষ সময়ে লোকের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে বলে বোধ হয়।

মৌলীক্ষা মায়ের মূর্তি হতে আলো

রাত্রে মন্দির পরিসরে সাধারণ অস্বাভাবিকতা ছাড়াও সময় বিশেষে মৌলীক্ষা মায়ের মূর্তিও অলৌকিক হয়ে ওঠে। কখনও কখনও মায়ের মূর্তি হতে নীল আলোর আভা বিচ্ছুরিত হয়ে গর্ভগৃহ আলোকিত হয়। সমসাময়িক কালে স্বল্প ব্যবধানে পরপর দুইবার একই রকমের ঘটনা ঘটে। ফলে বেশ কিছু ভক্তের ঐ দৃশ্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্ত্তিক মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরের ভিতর হঠাৎ আলোকিত হওয়ার প্রথম ঘটনাটি ঘটে। সেদিন ছিল ভাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন। মায়ের সন্ধ্যা-আরতি শেষ হলে, গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গেল। মন্দিরে রয়ে গেলেন তিনজন ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রিটায়ার্ড অফিসার শ্রীক্ষীরোদিন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কন্যা কল্যাণী ও কল্যাণীর এক বান্ধবী। আরতির পর মায়ের মূর্তির সামনে প্রদীপটা জ্বলছিল। একে অমাবস্যার পর ঘোর অন্ধকার, তার উপর মন্দিরের নিজস্ব অলৌকিক ভাব তো আছেই। ঐ নিস্তব্ধ, ছমছমে পরিবেশে,

স্বল্পালোকে তিনজনেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন।

কয়েক মিনিট পর প্রদীপটি শেষের ধোঁয়া ছেড়ে নিভিয়ে গেল। আর ঠিক ঐ মুহূর্তে ইন্দ্রজালের মত মন্দিরের ভিতরটা আলোকিত হয়ে উঠল নীলাভ আলোয়। ঐ হাল্কা আলোয় মায়ের মূর্তি এবং তাঁর অপূর্ব রহস্যময় মৃদু হাসি খুব পরিস্কারভাবে ওঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঐ অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণায় উপস্থিত সকলে বিহবল হয়ে পড়েছিলেন। কতক্ষণ এই অবস্থাটা চলেছিল তাঁরা বলতে পারেন নি। মন্দিরের বাইরে কতগুলো ছেলে হল্লা করে গেটের দিকে আসতে থাকায় অফিসার ভদ্রলোক নিজের অজ্ঞাতে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেললেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভিতরের নীলাভ আলোর রশ্মি আর একবার ইন্দ্রজালের মত টুপ্ করে নিভিয়ে গেল। *

দ্বিতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটে প্রথমটির প্রায় দেড়বছর পর ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ। সেদিনও সন্ধ্যা-আরতি শেষ হয়ে যাবার পর গ্রামেরই তিনজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক মৌলীক্ষা মায়ের বারান্দায় বসে ঐ অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনজনের মধ্যে দুর্গাশঙ্কর বাবু ছিলেন একজন। তিনি ঐ ঘটনাটি লিখে রেখে গিয়েছেন। তাঁর লেখাটি ছিল এইরূপ —

"বিগত ১৩৮৯ সনের ২১শে বৈশাখ আমি এবং আমার দুই বন্ধু গোপাল ও রাজেন মৌলীক্ষা মায়ের সান্ধ্যকালীন আরতি দর্শনে যায়। আরতি সমাপ্ত হওয়ার পর সকলেই গৃহে ফিরে যায়। আমরা তিনজনে কিছুক্ষণ মাতৃ মন্দিরে উপবেশন করি। মন্দিরে কাঠের দরজা উন্মুক্ত ছিল। লৌহের গেটটি তালা বন্ধ করে পূজারী বাড়ি গেল। মন্দির প্রাঙ্গণ নির্জন। মন্দির মধ্যে কেবল প্রদীপটি জ্বলছিল । মূর্তির সম্মুখভাগে আমি এবং আমার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুই বন্ধু। আমরা তিনজনেই পদ্মাসনে বসে বন্ধুবর রাজেনের স্বরচিত মৌলীক্ষা স্তুতি-বিষয়ক সঙ্গীতটি একাগ্রচিত্তে শুনছিলাম। যদিও গানটির মধ্যে ছন্দ বা সুরের সামঞ্জস্য ছিল না, তবুও ছিল গভীর অর্থবোধ ও ভক্তিরস, যার জন্য আমরা তিনজনেই আবিষ্ট হয়ে পড়ি। হয়তো তিনজনেরই মন একই নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছায়।

** শ্রীক্ষীরোদিন্দু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরের দিন সকালেই আগের রাতের অভিজ্ঞতাটি লেখককে শুনিয়েছিলেন।*

ইতিমধ্যে প্রদীপটি কখন যে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নির্বাপিত হয়েছে আমাদের কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, মায়ের তৃতীয় নয়ন হইতে নীলাভ আলোকরশ্মি সম্মুখভাগে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র মন্দিরের অভ্যন্তর পর্যন্ত আলোকিত হইতেছে। আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। বন্ধুদের নাড়া দিলাম এবং তিনজনেই মায়ের বিভূতি দর্শন করলাম। তিনজনের চক্ষুকে অবিশ্বাস বা মনের ভ্রম বলা চলে না।" *

এইসব অলৌকিক ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কিন্তু বাস্তবে ঐগুলি ঘটে আসছে। এ বিশ্বে অনেক ক্রিয়ার কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। লীলাময় ঈশ্বর সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদিকে এ বিষয়ে অপূর্ণ রেখেছেন।

আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য মৌলীক্ষা মায়ের সাধন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। যদিও তন্ত্রমতে মৌলীক্ষা মায়ের পূজা হয় তথাপি মৌলীক্ষা-সিদ্ধির জন্য পঞ্চ 'ম' কার সহযোগে সাধনার পরিবর্তে রাজযোগই প্রশস্ত বলে মনে হয়। মোক্ষলক্ষ্যে আগুয়ান ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন যোগমার্গের ব্যবস্থা প্রাচীন ঋষিগণ হিন্দুশাস্ত্রে রেখে গেছেন। শিবসংহিতায় চারটি বিশিষ্ট যোগের উল্লেখ আছে। যথা —

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থ রাজযোগাস্যাৎ দ্বিধাভাব বর্জিত॥

অর্থাৎ যোগ চতুর্বিধ। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ। এর মধ্যে রাজযোগ দ্বিধাভাগ বর্জিত । এই যোগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উক্ত আছে —

"যথার্করশ্মি সংযোগাদর্ককান্ত হুতাশনম,
আবিষ্করতি নৈকঃ সন্ দৃষ্টান্ত স তু যোগীনাম।"
— শিব সংহিতা

যেমন সূর্য্যকান্ত মণি সংযোগে সূর্য্যরশ্মি সকল দাহ্য বস্তুতে কেন্দ্রীভূত

** শ্রীদুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীশ্রীমৌলীক্ষা মাতা সেবা সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের অষ্টম সংখ্যায় 'জাগ্রত প্রতিমা' নামক এক নিবন্ধে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।*

হইলে উহাকে অগ্নিময় করিয়া তোলে, সেইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন যোগ দ্বারা আত্মসংস্থ হইলে উহার স্বরূপ প্রকাশিত করে। রাজযোগকে অষ্টাঙ্গযোগও বলা যায়।

ত্রিগুণাতীতের কাছে পৌঁছুতে গেলে সত্ত্বগুণের মাধ্যমেই এগুতে হয়। সত্ত্বগুণাশ্রিত রাজযোগীদের মন স্বচ্ছ, হৃদয়ে ভক্তির ঢেউ আর তাঁরা সাধনপথে একনিষ্ঠ।

মৌলীক্ষা মায়ের কৃপাও রাজযোগীদের উপর সর্বদা বর্ষিত হয়েছে। এই সিদ্ধপীঠে কাপালিক, বীরাচারী, পিশাচসিদ্ধ, বেদান্তবাদী প্রভৃতি নানা মতবাদের সাধক এসেছেন কিন্তু তাঁদিকে মৌলীক্ষা-সিদ্ধ হতে দেখা যায় নাই। উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সাধকগণ, যাঁরা মৌলীক্ষাস্থানে কারণ সহযোগে সাধনা করতে এসেছেন, তাঁরাও সকলে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন। অথচ তন্ত্র-মন্ত্রহীন, সাধনমার্গের অনুশাসন-বিহীন তারাপীঠ ভৈরব বামদেব এখানে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন অতি সহজেই। তাঁর যোগ ছিল রাজযোগ। সে যোগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। ধারণা হয় তিনি জন্মান্তর হতেই রাজযোগে সিদ্ধ ছিলেন যার জন্য এ জন্মে অতি অল্প বয়সেই সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নূতন করে তাঁকে অষ্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি — কোনটিরই অভ্যাস করতে হয় নাই।

মলুটীতে বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপার পুরো নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ১২৪৪ সনের শিবচতুর্দশীর দিন তারাপীঠের নিকটস্থ আটলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৩১৮ সনে। পিতার নাম সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। সর্বানন্দর ছয় সন্তানের মধ্যে দুইটি পুত্র ও অন্যগুলি কন্যা। বামাচরণ ছিলেন সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয় আর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

সর্বানন্দর আর্থিক সংগতি কোন সময়েই ভাল ছিল না। সংসারে ছিল নিত্য অভাব। এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলা ১২৬২ সনে অনেকগুলি অসহায় নাবালক এবং নাবালিকা রেখে সর্বানন্দ পরলোক গমন করলেন। বামাচরণের বয়স তখন প্রায় আঠারো বৎসর হলেও তিনি ছিলেন, তাঁর

নিজের ভাষায় 'চ্যাবা' অর্থাৎ বোকা মানুষ। সর্বানন্দের বিধবা পত্নী রাজকুমারী দেবী, ছেলে-মেয়েদের ভরণপোষণের ভার নিয়ে পড়লেন বিপদে। বাধ্য হয়ে বামাকে তাঁর মামার বাড়ি নবগ্রামে পাঠাতে হল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর বামদেব ফিরে এলেন আটলায়। অসহায়া রাজকুমারী দেবীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও সংসারে দারিদ্র্যের বন্যা রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেইজন্য বাড়ির বড় ছেলে বামদেবের উপর চাপ পড়তে লাগল কিছু একটা করার জন্য। উদাসীন বামদেবও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়তেন। তিনিও চাইছিলেন, যে কোন প্রকারের একটা কর্ম করে সংসারের আর্থিক অনটন কিছুটা লাঘব করেন। হয়তো মা তারা তাঁর মনের কামনা জেনেই আচম্বিতে একদিন যোগাযোগ করে দিলেন মলুটীর ফতেচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

আটলার পাশের গ্রাম মহুলা। একেবারে লাগালাগি। সেখানকার বর্দ্ধিষ্ণু ঘোষাল পরিবারের এক ভাগ্নীর সঙ্গে মলুটীর ফতেচাঁদের বিয়ে হয়েছিল। মাঝে মাঝে মামাশ্বশুরের বাড়ি মহুলায় আসা-যাওয়া করলেও আটলার বামাচরণের সঙ্গে ফতেচাঁদের কোনদিন পরিচয় ছিলনা। পরিচয় হল ঘোষালবাড়ির এক বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে। ঐ শ্রাদ্ধে পঞ্চগ্রামী ভোজ হয়। ভোজ খেতে বামাচরণও মহুলা এসেছিলেন আর তখনই বামদেবের সঙ্গে জামাইবাবু ফতেচাঁদের প্রথম পরিচয়।

আটলার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন মহুলার ঘোষালবাড়ির জামাই ফতেচাঁদকে খুব ভাল করে চিনত। সেই বলল - 'জামাইবাবু আপনাদের তো জমিদারের গাঁ, বামাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও একটা কাজে লাগিয়ে দেন না ? ওদের এখন খুব অভাব'।

ঐ ব্যক্তির অনুরোধে রাজি হয়ে ফতেচাঁদ পরের দিনই বামাকে সঙ্গে করে মলুটী পৌঁছালেন।

বামদেবের সঙ্গে ফতেচাঁদের বয়সের খুব একটা তারতম্য ছিলনা। সেইজন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মলুটীতে বামদেবকে কিছু একটা কর্ম জুটিয়ে দেবার জন্য ফতেচাঁদ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ সময় তাঁর বাবা রামলাল ছয় তরফের জমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বামদেবের একটা ব্যবস্থা

করে দেওয়ার জন্য বাবাকে চেপে ধরলেন ফতেচাঁদ।

রামলালের চেষ্টায় ছয় তরফের নারায়ণ মন্দিরে বামদেবের একটা কাজের ব্যবস্থা হল। পূজার জন্য ফুল তোলা ও মন্দিরে পূজার ব্যাপারে ফাই-ফরমাস খাটার দায়িত্ব দেওয়া হল বামদেবকে। বেতন নির্দিষ্ট হল মাসে দুটাকা। জমিদার বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হল আর থাকার ব্যবস্থা হল রামলালের বাড়িতে।

এখন যে বাড়িতে ফতেচাঁদের পুত্র যোগেশচন্দ্রের বংশধরগণ বাস করছেন ঐ জায়গাটি অনেক পরে জমিদার, বাবু করুণাসিন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। রামলালের যে সাবেক বাড়িতে বামদেব ছিলেন সেটির দাগ নম্বর ১৫১২। ঐ বাড়িটি রামলালের বাবা বৃন্দাবন বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পেয়েছিলেন। বামদেবের বাস করা ঐ বাড়িটি বহুদিন আগে ভেঙে গিয়ে ঢিপি হয়ে রয়েছে।

ফুল তোলা কাজ পেয়ে বামদেবের ভারি স্ফুর্তি। খুব ভোরে উঠে চলে যেতেন গ্রামের দক্ষিণদিকে চিলে কাঁদরের ধারে। ঐখানেই ছিল বাবুদের ফুলবাগান। প্রতিদিন রাশি রাশি ফুল তুলে এনে দিতেন পুরোহিত মশায়কে। ওরই মধ্যে এক-একদিন আবার কি রকম যেন উদাস হয়ে যেতেন।

ফুলবাগানের একদিকে শ্মশান। ভাঙ্গা হাঁড়ি-কুড়ি, ছেঁড়া কাঁথা-কাপড়, পোড়া কাঠ আর আধপোড়া বাঁশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মধ্যে চিলে নদী এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে তারাপীঠের মন্দিরের দিকে। ঐ মন্দিরের কাছে চিলে কাঁদর দ্বারকা নদীতে মিশেছে। ছোট একটা আঁকশি নিয়ে কাঠমল্লিকা গাছের ডালে বসে বামদেব চারিদিকে তাকিয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে উদাস এবং পরে সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। মন্দিরে ফুল পৌঁছুতে এক একদিন দেরি হতে লাগল।

সেদিনও অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তখনও মন্দিরে ফুল পৌছয় নাই। পুরোহিত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, শেষে বামদেবের খোঁজে ফুলবাগানে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে দেখে কাঠমল্লিকা গাছের যেখান থেকে শাখা বেড়িয়েছে সেইখানে বামদেব বসে আছেন । চোখ স্থির,

নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া গেল। পুরোহিতের ধারণা হল বামদেব গাছের ডালে বসে ঘুমিয়ে পড়েন। বামদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে জমিদার বাবুকে পুরোহিত মশায় সেইভাবেই বোঝাল এবং শেষে মন্তব্য করল যে, বামাকে দিয়ে আর মন্দিরের কাজ চলবে না। মলুটীর জমিদাররা হঠকারী ছিলেন না। তাঁরা বরাবরই সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন। তাই পুরোহিতের বর্ণনা শুনে বামদেবের ঐ অবস্থা নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছা করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে সুযোগ এল। এবার জমিদার বাবু নিজের চোখে বামদেবের ভাবান্তর এবং সমাধি লক্ষ্য করলেন। তিনি তাঁর মধ্যে এক উচ্চস্তরের সাধক হওয়ার সম্ভাবনা অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। সেইজন্য বামদেবের উপর কোন কাজের চাপ দিতে তিনি পুরোহিতকে নিষেধ করে দিলেন।

নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে বামদেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আগে বামদেবকে তাঁর নিয়মিত কাজকর্মের ফাঁকে মৌলীক্ষা মন্দিরে কখনও কখনও দেখা যেত। এখন তিনি দিনের বেশী সময় মায়ের মন্দিরে কাটাতে লাগলেন। নাওয়া-খাওয়ার সময় নাই, জমিদার বাবুর পেয়াদা ডেকে নিয়ে গেলে তবে খাওয়া হয়। কখনও সন্ধ্যার পর ফতেচাঁদ তাঁকে মন্দির হতে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন।

রামলালের বাড়ীতে ছিল বামদেবের শোবার ব্যবস্থা, কিন্তু রাত্রিবেলায় পাঁচিল টপকে তিনি পালিয়ে যেতেন মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরে। রাতভোর ঐখানেই রয়ে যেতেন। বামদেবের এই ধরনের খাপছাড়া ব্যবহার গ্রামের লোকের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। তিনি কিন্তু লোকেদের মধ্যে থেকেও লোকচক্ষুর অন্তরালে মৌলীক্ষা-সিদ্ধির ঘটটি পূর্ণ করে নিলেন।

এদিকে বামদেবের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সাধারণভাবে তাঁর ব্যবহার ছিল বালকবৎ। এখন মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য খুব চঞ্চল অবস্থাও দেখা যেত। ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে অনেক সাধনার পর যোগীদের মধ্যে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, বামদেবের মধ্যে তাঁর কিশোর বয়সেই সেইসব ভাব কমবেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এরই মধ্যে একদিন, বামদেব জানিয়ে দিলেন তিনি তারা মায়ের কাছে তারাপীঠ চলে যাবেন। এর কিছুদিন পর সত্যসত্যই জমিদার বাবু ও গ্রামে তাঁর বন্ধুস্থানীয় অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও বামদেব আর মলুটীতে থাকলেন না। চলে গেলেন তারাপীঠের পথে।

ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেমন জলের ভারে পূর্ণতা লাভ করে সমুদ্রের পানে ছুটে চলে, তেমনি বামদেব প্রাথমিক সিদ্ধির পূর্ণতা লাভের পর বৃহত্তরের আকর্ষণে ছুটে চলে গিয়েছিলেন।

মলুটীতে বামদেবের আসা এবং চাকরি করা প্রসঙ্গে তারাপুরের শ্রীজগদীশ মজুমদার, যিনি কম্বলীবাবা নামে পরিচিত, বলেন — "............... এতো সবারই জানা যে মলুটী হল বাম ভৈরবের সর্বপ্রথম সাধনপীঠ। কিশোর বাম মলুটীর ছয় তরফের নারায়ণ মন্দিরের সেবক পরিচারকের ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

আমার শোনা কথা। তবে সত্য বলেই মনে করি। তখনকার গ্রামবৃদ্ধদের অনেকের মুখেই শোনা যে, মলুটীতে বামদেবের এক বোনের বিয়ে হয়েছিল। তাঁর নিজের বোন, না সম্পর্কিত বোন, সে অবশ্য জানি না। বিয়ে হয়েছিল অক্ষয় রায় ও হরি রায়দের বংশে। অক্ষয় রায়রা কেন জানি না, গ্রাম্যসমাজে পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। হয়তো ভগ্নীর বিবাহ হওয়ার সুবাদেই বালক বামা মলুটীতে এসেছিলেন। বামার জন্মপল্লী আটলা। মলুটী থেকে ৭/৮ মাইল। বামা শৈশবকাল হতেই কেমন যেন ছন্নছাড়া, আত্মভোলা, পাগলাটে ভাব নিয়ে থাকত। পাঠশালার সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোই কাজ। তিত-বিরক্ত হয়ে তাই বোধ হয় অভিভাবকরা বামাকে পাঠিয়ে দিলেন মলুটী। ভগ্নীপতি জমিদারকে বলে কয়ে কোনমতে বামাকে ঢুকিয়ে দিলেন চাকরিতে। চাকরি কি ? না, ছয় তরফের নারায়ণ মন্দিরে পরিচারকের কাজ। পরিচারক ! মন্দির ধোয়া, মোছা, উঠোনে ঝাঁট-পাট দেওয়া আর পূজোর ফুল তোলা। তার পরিবর্তে দুবেলা দুটো খেতে পাওয়া। বামার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বামা মহানন্দে কাজ করে আর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, নেচে-কুদে, রাস্তাঘাট মাত করে ঘুরে বেড়ায়। আসলে নারায়ণ মন্দিরের কাজ কিন্তু বামার প্রধান টান রাজবংশ অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী মৌলীক্ষার প্রতিই সমধিক । ফুরসৎ পেলেই বামা ছুটে যায়

মৌলীক্ষা মার কাছে। চিৎকার করে ডাকে 'মা', 'মা' বলে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে। আবার কখনও মন্দির খুলে ঢুকে পড়ে — ফুল, লতাপাতা দিয়ে নিজের খেয়ালে মায়ের পূজো করতে। খাদ্যদ্রব্য যদি কিছু কখনও জোটে, সোজা ছুটে এসে মার মুখের কাছে ধরে চিৎকার করে 'খা', 'খা' বলে। শুদ্ধ-অশুদ্ধের বাছবিচার নাই। সময়-অসময় জ্ঞান নাই। কাণ্ডাকাণ্ডের বালাই নাই। যখন তখন মৌলীক্ষার কাছে এসে ধর্না দেয়। 'বড়মা', 'বড়মা' বলে চিৎকার করে আর কাঁদে।" [১১৮]

*　　*　　*　　*　　*

ফতেচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র যোগেশচন্দ্রের (১২৭৬-১৩৩০) যখন জন্ম হয় তখন তারাপীঠে বামদেব দেশবিখ্যাত সিদ্ধ-সাধকরূপে পরিচিত। সম্ভবতঃ ১৩০০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি যোগেশচন্দ্র ছয় তরফের নারায়ণ মন্দিরে পূজার ভার পান। বাবার মুখে বামদেবের গল্প শুনে বাল্যকালেই তিনি বামদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাই মাঝে মাঝে পূজো ছেড়ে তারাপীঠের শ্মশানে বামদেবের কাছে চলে যেতেন। ছয় তরফের বাবুদের তরফ হতে পেয়াদা গিয়ে তারাপীঠ থেকে যোগেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসত।

পুলিশ-পেয়াদাকে বামদেব বড়ই উৎপাত ভাবতেন। তাই একদিন যোগেশকে বললেন — 'যোগ্‌শা ইখেনে তোর কিস্‌সু হবে না বাবা ! তু মলুটীর মৌলীক্ষা মায়ের পাঠশালায় আগে পড়, তারপর ইখেনে আয়'। অর্থাৎ আগে মৌলীক্ষা মায়ের পাঠশালায় হাতে খড়ি, তার পর তারা মায়ের কলেজে স্নাতক উপাধি। বামদেব কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর বন্ধুপুত্র যোগেশকে যোগসাধনের সুনির্দিষ্ট পথটি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বামদেব জানতেন যোগসাধনার পথে বাধা দেওয়ার জন্য দেবতারা অনেক রকম উৎপাতের সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রে একে বলে ইন্দ্রদেবের উৎপাত। সেইজন্য কৃপাপাত্র যোগেশকে বরাভয়রূপে একটি ত্রিশূল ও

---

(১১৮) হেম (শ্রীঅরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়) জয় জগদীশ হরে, পৃঃ ১৩৫-১৬৭

একটি শঙ্খ দেন এবং বলেন যে, এগুলি তাঁর পরিবারের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে।

যোগেশচন্দ্র শাঁখটিকে ঘরে এবং ত্রিশূলটিকে ছয় তরফের কালীমন্দিরের এক কোণে রেখে দিয়েছিলেন। কালীপূজার সঙ্গে ত্রিশূলটিকে কালীমন্ত্রে পূজা করতেন। কালক্রমে বামদেবের দেওয়া ত্রিশূলটিও কালী মায়ের প্রতীক হয়ে পড়ে। যোগেশচন্দ্রের বংশধরদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ছয় তরফের কালীমন্দির হতে ১৩২৩ সনে অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিশূলটি ঘরে আনেন। প্রথমে এটি বাসঘরের মধ্যেই রাখা হয় কিন্তু এক সন্ধ্যায় যোগেশচন্দ্রের বড় ভায়ের স্ত্রী ঐ ত্রিশূলের কিছু অলৌকিকতা দেখে ভয় পেয়ে যান। এরপরে ওটিকে তুলসীতলায় রাখা হয় এবং শেষে, উঠোনের একটি কুল গাছের নীচে থাকে। সেই সময় হতেই ত্রিশূলটিকে নিয়মিত কালীরূপে পূজা করা হয়ে আসছে। যোগশচন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী দীর্ঘদিন নিজেই পূজো করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ পরিবারের লোকেরা কর্মসূত্রে অনত্র বসবাস করতে বাধ্য হলে পূজারী দিয়ে ত্রিশূলের পূজা অদ্যাবধি চলে আসছে। *

বর্তমানে ঐ বাড়ির উঠোনে বামদেবের একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।[১১৯] মন্দিরের ভিতর এই গ্রামের অমূল্য সম্পদ ঐ ত্রিশূল এবং শাঁখটির সংরক্ষণ করা হয়েছে। বামদেবের একটি প্রতিমা ও মা কালীর একটি শিলামূর্তিও ঐ মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে ।[১২০] মহাসাধক বামদেবের ছোঁয়া এই পবিত্র স্মৃতি পুণ্যভূমি মলুটীর মহত্ত্ব আনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

উত্তরকালে তারাপীঠে সিদ্ধিলাভের পর কৃপাসিন্ধু বামদেব তাঁর দু-চারজন অনুগৃহীত ভক্তকে পাঠিয়ে দিতেন মলুটীতে। বলতেন, 'আগে মলুটীর মৌলীক্ষাতলায় মাথা ঠুকে আয় তবে তারা মার কাছে পাত্তা

** স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, ফতেচন্দ্রের মাধ্যমে বামদেবের মলুটীতে চাকরি করতে আসা, তাঁদের সাবেক বাড়িতে বামদেবের বাস করা এবং বন্ধুপুত্র যোগেশকে তাঁর বংশাবলীর কল্যাণ কামনায় বামদেব দ্বারা একটি ত্রিশূল ও একটি শাঁখ দেওয়ার মত বিষয়গুলি লিখিত হয়েছে।*

(১১৯) Plate - XVIII

(১২০) Plate - XIX

পাবি।' অর্থাৎ মৌলীক্ষা সাধনে সিদ্ধ না হলে তারা-সিদ্ধি ঘটা সম্ভব নয়। এইরকম একজন ছিলেন ইঁটে গোঁসাই। তিনি বামার উপদেশে মলুটী এসে তাঁর বাকি জীবন মৌলীক্ষা মায়ের সাধনায় এবং নিষ্কাম সমাজসেবায় কাটিয়ে এই অঞ্চলেই দেহরক্ষা করেন।

অন্য একজন ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য নগেন্দ্রনাথ বাগচি। তারাপীঠে তিনি নগেন গোঁসাই বা গোঁসাই বাবা নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূজ্যপাদ নগেন গোঁসাই এর সঙ্গে লেখকের এক সাক্ষাৎকারে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মলুটীতে বাস ও মৌলীক্ষা মা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছুটা বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, গুরু বামদেবের স্বর্গারোহণের প্রায় দশ বছর পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি মলুটীর মৌলীক্ষা মন্দিরে যান। বামদেব জীবিত থাকার সময় তাঁকে কিছুদিন মৌলীক্ষা মায়ের সাধনা করতে বলেছিলেন, কিন্তু গোঁসাইবাবা বামদেবকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি ছিলেন না। যে সময় তিনি মলুটী আসেন সে সময় ইঁটে গোঁসাই (সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী) দেহ রেখেছেন। মৌলীক্ষাতলায় তখন একজন গৃহী সন্ন্যাসী লালবিহারী বাবু জপ-তপে রত ছিলেন। গোঁসাইবাবা থাকবার জায়গা পান সাধু ঘরে। তিনি বললেন — "আরে ভাই, মলুটী জমিদারের গ্রাম। বাবুদের অবস্থা তখন রমরমা। ভিক্ষেয় যেতে হত না। ভিক্ষে পৌঁছে যেত মন্দিরে। নিশ্চিন্তে মায়ের জপ-তপ আর লালবিহারীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা। এত আনন্দ কোথাও পাই নাই। আমার জপ-তপে মৌলীক্ষা মা সাড়াও দিয়েছিলেন। পরে ফিরে এলাম তারাপীঠে।"

মলুটীর পরিচয় দিয়ে তারাপীঠে বামদেবের কাছে গেলে তাঁর মনটি স্নেহসিক্ত হয়ে উঠত। এ প্রসঙ্গে মলুটীর মেয়ে নরেন্দ্রবালার (চাঁদবুড়ির) সঙ্গে একদা বামদেবের কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে। তারাপীঠের সন্নিকটে চিতুরি গ্রাম ছিল নরেন্দ্রবালার শ্বশুরঘর। তাঁর কাছে শুনেছি বামদেব যে বৎসর মলুটীতে চাকরি করতে আসেন, সেই বৎসরই তাঁর জন্ম হয়। নরেন্দ্রবালার জন্ম বাংলা ১২৬৩ সনে এবং মৃত্যু ১৩৬১ সনে। সেক্ষেত্রে ১২৬৩ বঙ্গাব্দে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বামদেব সম্ভবতঃ মলুটীতে চাকরি করতে আসেন। বামদেব মলুটীতে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এক বছরের অধিক, সেটি তিনি বামদেবের মুখ হতে শুনেছিলেন।

নরেন্দ্রবালা তাঁর প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে কোমরের ব্যথা ভাল করার জন্য চিতুরি হতে তারাপীঠে বামদেবের কাছে যান। বামদেবের নাম তখন স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত, তবে সিদ্ধ-সাধক হিসাবে নয়, অসুখ-বিসুখ ভাল করার অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে। নরেন্দ্রবালার আসার কারণ জেনে বামদেব খুব রেগে ওঠেন। বলতে থাকেন — আমি কি ডাক্তার যে, তোর রোগ ভাল করব ? যতসব পাপ করেছিস ভোগ কর ইত্যাদি। নরেন্দ্রবালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বামদেবকে নরম করার জন্য বলতে থাকেন — 'বাবা আমি মলুটীর মেয়ে। আমি শুনেছি আপনি অনেকদিন মলুটীতে ছিলেন।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বামদেব সরল বালকের মত বলে উঠলেন — 'আপনি মলুটীর মেয়ে বাবা ? তা, আমি মলুটীতে অনেক দিন — একবছর দুবছর ছিলাম। আপুনি আবার আসবেন বাবা।' এবার নরেন্দ্রবালা সুযোগ পেয়ে জবাব দিলেন — 'কোমরে বেদনা, কি করে আসব বাবা ?' — 'ও ! এই লে তবে।' বামদেব পাশের চিমটেটা তুলে সজোরে এক ঘা কষে দিলেন নরেন্দ্রবালার পিঠে। চিমটের আঘাত খাওয়ার পর তাঁর বহুদিনের কোমরের ব্যথা একেবারে সেরে গিয়েছিল। *

অন্যটি ছিল বামদেবের নিকট ছয় তরফের জমিদারীর অংশীদার শ্রীচন্দ্র বাবুর পত্নীর কৃপাপ্রাপ্তি। শ্রীচন্দ্র বাবু ছিলেন ছয় তরফের জমিদারীর একের ছয় অংশের মালিক কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। লোকমুখে বামদেবের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ শুনে শ্রীচন্দ্রবাবুর পত্নী একদিন তারাপীঠে বামদেবের কাছে পৌঁছান। বেশ কয়েক বছর আগে বামদেব ছয় তরফের নারায়ণ মন্দিরে কাজ করেছেন, তবে এখন তিনি সিদ্ধপুরুষ। শ্রীচন্দ্রবাবুর পত্নী বামদেবকে প্রণাম করে মৃদুস্বরে বললেন — 'বাবা আমি মলুটী থেকে আসছি। মলুটীর ছয় তরফে আমার শ্বশুরবাড়ি। আপনার দয়ার জন্য এসেছি'। এক মুহূর্তে বামদেবের মন স্নেহসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বুঝেও গেলেন তাঁর আসার কারণ। চোখ বুজে খানিকটা ধ্যানস্থ থেকে তাকালেন এবং হাসিমুখে বললেন — 'ব্যাটা নাই মা, বিটি লিবি ?'

ঘোমটা আবৃত মুখে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই বামদেব চিমটেটা সজোরে মাটিতে আঘাত করে বললেন — 'জয় তারা। যা মা, একটো বিটি

** লেখক চিতুরি গ্রামের নরেন্দ্রবালার (চাঁদবুড়ির) কাছে ঘটনাটি শোনেন।*

হবে, নাম দিস জয়তারা'। বাকসিদ্ধ বামদেবের কথায় শ্রীচন্দ্রবাবুর একটি কন্যা হয়। তাঁর নাম দেওয়া হয় জয়তারা। নরেন্দ্রবালার মত জয়তারা দেবীও দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। *

বামদেবের দেহরক্ষার পর তাঁর মন্ত্রশিষ্য তারাক্ষ্যাপার শুভ পদার্পণ হয় এই পবিত্র সাধনভূমিতে। তারাক্ষ্যাপার শিষ্য গোপালক্ষ্যাপা অন্ততঃ দুইবার এখানে এসেছেন। প্রতিবারেই তিনি মৌলীক্ষাতলায় বেশ কিছুদিন থেকে হোম-যজ্ঞ করে কাটান। শোনা যায় বামদেবের গুরু কৈলাশপতিও নাকি একবার মলুটী এসে মৌলীক্ষা মাকে দর্শন ও প্রণাম করে যান। এই দিক হতে দেখতে গেলে বামদেবরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চার পুরুষ মলুটীতে পদার্পণ করে এখানকার মাটি পুণ্যময় করে গেছেন। বামদেব মৌলীক্ষা মায়ের স্বরূপ পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির জন্য পর্য্যায়ক্রমে মৌলীক্ষা ও তারা সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর মন্ত্রশিষ্য বা বিশেষ অনুগত ভক্তগণ মলুটীর মৌলীক্ষাতলায় সাধন প্রচেষ্টায় বারবার উপস্থিত হয়েছেন।

ভারতের সাধুসমাজ আদৃতা স্বনামধন্যা শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা একসময় তারা মাকে দর্শন করতে তারাপীঠ এসেছিলেন। ঐখানে থাকার সময় মলুটীতে মৌলীক্ষা মায়ের দর্শন করার জন্য তারা মায়ের নির্দেশ পান। আনন্দময়ী মা কালবিলম্ব না করে মলুটী চলে আসেন। মৌলীক্ষা মাকে দর্শন ও প্রণামের পর মন্দিরে উপস্থিত স্থানীয় ব্যক্তিদিকে ঐ ঘটনার কথা তিনি নিজমুখে বলে যান।

মৌলীক্ষা মায়ের নামে আকৃষ্ট হয়ে তারাপীঠ হতে এসেছিলেন ভাতু গোঁসাই নামে এক হঠযোগী। তিনি দীর্ঘকাল মন্দিরে বাস করে গেছেন। তিনি পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি বের করে জলে ধুয়ে আবার নাকি শরীর মধ্যে প্রবেশ করাতে পারতেন। এখানে এসে তিনি হঠযোগ ত্যাগ করে মন্ত্রযোগে মায়ের সাধনা করেন। প্রায় সারাদিন সামনের শিবমন্দিরের ভিতর জপ-তপ নিয়ে থাকতেন, লোকালয়ে খুব কম আসতেন। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে শোনা গিয়েছে যে, মায়ের মন্দিরে কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর পরই হঠাৎ একদিন মন্দির ত্যাগ করে কোথায় যে চলে যান তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

** জয়তারা দেবী তাঁর মায়ের কাছে শোনা নিজের জন্মপূর্ব ঘটনাটি লেখককে শুনিয়েছিলেন।*

আরও পরে এসেছেন কঙ্কালীবাবা। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৌলীক্ষা মায়ের সাধনা করে যান। শোনা যায় সাধনার ঐকান্তিকতায় মায়ের কিছু বিভূতি দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল।

এসেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার লালবিহারীবাবু। তিনি মন্দিরের দক্ষিণে, দেওয়ালের বাইরে পাকাপোক্ত ভাবে একটি গুহা তৈরী করিয়ে মন্ত্রযোগে সাধনা করে গেছেন মৌলীক্ষা মায়ের। তিনি ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী।

মৌলীক্ষা দরবারের নিস্তব্ধতার মধ্যে সাধকের সারি হতে এক আসছেন, এক যাচ্ছেন, ঠিক যেন নিস্তরঙ্গ পুকুরে মাঝে মাঝে ছোট ঢিল ফেলে একটুখানি বাঁকা স্রোত তোলার ন্যায়।

বিভিন্ন সাধকের মৌলীক্ষা সাধনার ধারা ও তার পরিণতি দেখে মনে হয় মায়ের সাধনার জন্য যোগীদের বাহ্যাড়ম্বরের কোন প্রয়োজনই হয়না।

'মন চাঙ্গা তো কঠৌতি মে গঙ্গা,'
তেমনি — 'চিত্ত শুদ্ধ তো মৌলীক্ষা সিদ্ধ।'

মধ্যযুগের শেষভাগ হতে মলুটী গ্রাম শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্তমতের এক অপূর্ব সমন্বয় রেখে নিজেকে যথার্থ সাধনভূমিতে পরিণত করেছে। মৌলীক্ষা মায়ের সাধনায় যেমন রাজযোগীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তেমনি বীরাচারীগণও তাঁদের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেছেন এই সাধন ভূমিতে। গ্রামের সতীঘাটি মহাশ্মশানে * এক শতাব্দী পূর্বেও শবসাধনা করার ধারা অক্ষুন্ন ছিল। ঐ সময়ে রাজবংশেরই এক সদস্য সিকির বাড়ির অন্নদাপ্রসাদ রায় শবসাধনায় সিদ্ধ শেষ যোগী বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এখানকার রাজারা চিরকালই সাধক প্রকৃতির ছিলেন। সাধক রাজাদের পুণ্যকর্মে এবং অগণিত যোগী ও সাধুপুরুষদের সাধন প্রচেষ্টায় এই স্থান গত তিন শতাব্দী ধরে প্রথম শ্রেণীর তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত।

অভীষ্টলাভের জন্য এই সিদ্ধপীঠে যেমন বহুসংখ্যক গৃহী ভক্তদের আগমন হয় তেমনি মুমুক্ষু সাধু ও সাধবীদের নিরবচ্ছিন্ন আগমনের মধ্যে আজ পর্যন্ত কখনও ছেদ পড়ে নাই।

** গ্রামের মহাশ্মশানটিকে সতীঘাট বলা হয় তার কারণ ঐ শ্মশানে ১২০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ এখন হতে ২০০ বছর পূর্বে স্বর্গীয় পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় এর দুই স্ত্রী করুণাময়ী দেবী ও অপর্ণাময়ী দেবী স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে সহমরণে যান।*
— শ্রীদুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁর পারিবারিক পুরাতন কাগজপত্র হতে ঘটনাটি সংগৃহীত।

মৌলীক্ষা মায়ের প্রাচীনত্ব

মৌলীক্ষা মায়ের আজকের যে মূর্তি দেখা যাচ্ছে, সেটি পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে গালার আবরণী দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। গালার মুখোশের উপর নাক ও মুখের স্পষ্ট আকৃতি ছিল এবং রূপো নির্মিত তিনটি চোখও বসানো ছিল। মূর্তিটিকে প্রতিদিন স্নান করানোর ফলে গালার মুখোশের ভিতর জল ঢুকে মায়ের চেহারা মাঝে মাঝে সামান্য বিকৃত হয়ে যেত। সেই অবস্থার নিরাকরণের জন্য বিগত ১লা পৌষ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে) মায়ের মূর্তির অঙ্গরাগ করানো হয়। গালার মুখোশটি খুলে ফেলার পর বর্তমান মূর্তিটি প্রকাশ্যে আসে। তবে মূর্তির নাকের কিছু অংশ ও বাঁদিকের কানটি ভাঙা ছিল। আরও দেখা যায় মাথার উপরে কয়েকটি হাল্কা ফাটল চিহ্ন। ভারী কোন বস্তু দিয়ে আঘাত করলে যেমন হয় সেই রকম। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আগের কোন পুরোনো মন্দিরের ছাদ মূর্তির উপর ভেঙে পড়েছিল ফলে মূর্তির ঐ ক্ষতিগুলি হয়। সে সময় হয়তো নাক ও কান জোড়া লাগাবার মত সিমেন্টের প্রচলন হয় নাই যার জন্য মূর্তির ভাঙা অংশগুলি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে গালার মুখোশ দিয়ে ওগুলিকে আটকে রাখা হয়। রাজারা বর্তমান মন্দিরটি সেই প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপরেই নির্মাণ করিয়েছেন বলে বোধ হয়। কেননা, মৌলীক্ষা মা রাজাদের চার অংশেরই অর্থাৎ চৌতরফী কুলদেবী। চারটি তরফের রাজারা সংখ্যাধিক বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন অথচ কুলদেবীর জন্য রয়েছে একটি ছোট মন্দির ! সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়লেও মৌলীক্ষা মায়ের মূর্তি যথাস্থানে ছিল। সেইজন্য নূতন মন্দির তৈরী করা, মূর্তি স্থানান্তরিত করা এ সবে না গিয়ে পুরোনো মন্দিরের দেওয়ালেই আজকের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে মনে করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না।

অঙ্গরাগের সময় দেখতে পাওয়া যায় মূর্তিটির পিছনের অংশ দেওয়ালে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়া আছে এবং মায়ের মূর্তির নীচে চুন-সুরকির মসলা মাখানো কয়েকখানা টালি দিয়ে পুরোনো বেদীটি তৈরী করা ছিল। অঙ্গরাগের সময় ঐ চুন-সুরকির মসলা ধুলোর মত হয়ে গিয়েছিল। টালি কয়খানি খুলে নেওয়ার পর তার নীচে চারকোনা একটি কুয়ো দেখা যায়। কুয়োটি যেমন ছিল সেইরকম রেখে, ওর উপরে একটি চৌকনা ঢালাই প্লেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির নির্মাণে বা মূর্তি স্থাপনের সেই প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কিছু ধর্মীয় রীতি সম্বন্ধযুক্ত কিনা, কয়েকজন বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেও সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

তবে, ছোট আয়তনের, স্তূপের আকারে মন্দির, মূর্তি স্থাপনের শৈলী ইত্যাদি বিচার করে মৌলীক্ষা মায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।

তারা মা ও মৌলীক্ষা মা

দুর্গাপূজার পর শুক্লা চতুর্দশীতে মলুটীর তরফ হতে তারা মায়ের প্রথম পূজার ব্যবস্থা রাজা আনন্দচন্দ্র শুরু করেছিলেন। ঐ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত। ঐদিন মলুটীতেও মৌলীক্ষা মায়ের মহাপূজা হয়। তারা মা ও মৌলীক্ষা মায়ের পূজা ও মহাপূজাগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

আবার তান্ত্রিক বৌদ্ধদের তন্ত্রসাধনা বিশ্লেষণ করলে তারা মা ও মৌলীক্ষা মায়ের মধ্যে আরও খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে বৌদ্ধরা পাঁচটা স্কন্ধকে মেনে নিয়েছেন — রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। পাঁচটা স্কন্ধের পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ আছেন। তাঁদের পাঁচজন বুদ্ধশক্তি আছেন এবং তাঁরা পাঁচটি কুলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে সংস্কার স্কন্ধ হতে উৎপত্তি, অমোঘসিদ্ধির শক্তির নাম তারা। তিনি উত্তরমুখে অবস্থিতা। তারাপীঠের তারা মায়ের সঙ্গে অমোঘসিদ্ধির শক্তি তারার বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। অন্যদিকে সংজ্ঞা স্কন্ধ হতে উৎপত্তি, ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরা। তাঁর বর্ণ লাল, তিনি পশ্চিমমুখী। মৌলীক্ষা মায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রের

দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায় দুই ধ্যানীবুদ্ধের দুই শক্তি তারা মা ও মৌলীক্ষা মা দুটি কুলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সেইজন্য উভয়ের উদ্ভব প্রায় একই সময়ে হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। বৌদ্ধ পরবর্তী যুগে এদেশে বৌদ্ধদের অনেক দেব-দেবী, হিন্দু দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

নাককাটি মা

তিনশো বছর আগে মলুটী গ্রামকে নান্‌কার তালুকের রাজধানী করা হয়েছিল এবং সেই সময় হতেই এখানে নানা দেব-দেবীর স্থাপনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামের বাইরেও পূজা-সংস্কৃতির ধারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

মলুটীর পূর্বদিকে মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির হতে দুই কিলোমিটার দূরে ভাঙাবাঁধ নামে একটি আদিবাসী গ্রাম আছে। তার পরেই রয়েছে নাককাটির বন। কয়েক বছর আগেও ঐ স্থান ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। এখন দু-চারটি বড় গাছ ছাড়া স্থানটি ঝোঁপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছে পূর্ণ। এই বনের ভিতরেই রয়েছে সিংহবাহিনীর একটি থান। সেখানেই পূজা হয় নাককাটি মায়ের। দেবীর নাম অনুসারে বনের নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়, কেননা, থানের উপর একফুট উচ্চতার যে স্ত্রী মূর্তিটি রাখা আছে তাঁর নাকটি কাটা বা ভাঙা। ঐ মূর্তিটি কালোপাথরে নির্মিত। সম্ভবতঃ পালযুগের যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি বাংলার বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া যায় সেইগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। সিংহবাহিনী মলুটীর রাজাদের কুলদেবী। তাই মলুটী গ্রামের আশেপাশে যে সমস্ত জায়গায় সিংহবাহিনীর থান বলে পূজা হয় সেগুলির সঙ্গে মলুটীর পূজা-সংস্কৃতি সম্বন্ধযুক্ত। 'বছরে দুবার, জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি ও পয়লা মাঘ দুর্গামন্ত্রে নাককাটি মায়ের পূজা হয়। সেই আদিকাল হতে বংশপরম্পরায় মলুটীর পূজারীরাই নাককাটি মায়ের পূজো করে আসছেন। ভাটিনা ও সেনবাঁধার সিংহবাহিনী থানে পূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও যেমন মলুটীর জমিদারগণ আর প্রত্যক্ষভাবে ঐগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকেন না, তেমনি নাককাটি মায়ের পূজার ব্যবস্থাও এখন স্থানীয় লোকেরাই করে থাকেন'। *

** নাককাটি মায়ের পূজারী শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তথ্যটি দিয়েছেন।*

নান্‌কার মলুটী

বনদেবীর পূজা

পয়লা মাঘ বনদেবীর পূজার নির্দিষ্ট দিন। দুর্গামন্ত্রে পূজা হয় বনদেবীর। বাংলার বহু গ্রামে ঐদিন বনদেবীর পূজা করার প্রথা প্রচলিত আছে। মলুটীতেও আছে। মলুটীর উত্তরদিকে এক কিলোমিটার দূরে ধীরনগর গ্রামের শেষপ্রান্তে পূজা হয় বসুমতী নামে বনদেবীর ও গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে আদিবাসী গ্রাম বুড়িতলার পাশে বুড়ি নামের বনদেবীর পূজা হয়। মলুটীর জমিদারগণ বংশ পরম্পরায় এই পূজাদুটি চালিয়ে আসছেন।

পালযুগের নিদর্শন

মলুটীর পুরাকীর্তি নিদর্শনের মধ্যে মন্দির ভাস্কর্য্য এবং চিলা কাঁদর হতে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের মানবদের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর নির্মিত লঘু যন্ত্রপাতি ছাড়া মৌলীক্ষা মন্দির-পরিসর মধ্যে উত্তরদিকের নিম গাছের নীচে পালযুগে নির্মিত দুটি ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি ও ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরী একটি বড় গোলাকৃতি বেদীর অর্দ্ধাংশে রাখা আছে। বেদীটির ধারগুলি ফুটন্ত পদ্মফুলের মত খাঁজ কাটা। বড় মূর্তি স্থাপন করার জন্য পদ্ম আকারের এই বেদীটি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। নিম গাছের নীচে পালযুগের ঐ সকল নিদর্শনগুলিকে ষষ্ঠীঠাকুর বলে পূজো করা হয়। বিষ্ণুমূর্তি দুটি এতই ভেঙেছে যে, ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়েও মূর্তির স্বরূপ বোঝা যায় না। আবার কয়েকটি টুকরো হারিয়ে গেছে। চালির কিছু অংশ নিয়ে একটি টুকরোয় দেখা যায় গদা ধরে থাকা হাতের অংশ ও অন্য একটি খণ্ডে দেখা যায় শ্রীদেবীর (লক্ষ্মী ?) সম্পূর্ণ মূর্তি। দুটি বিষ্ণুমূর্তিরই উচ্চতা এক ফুটের বেশী নয়। দুটিতেই কেবল নীচের অংশ আছে এবং সেখানে গদাধরের দুটি করে পায়ের পাতা মাত্র দেখা যায়। [১২১]

(১২১) *Plate - XX*

গ্রন্থসূচী

'নান্‌কার মলুটী' বইখানি লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকগুলির লেখক এবং প্রকাশকদের কাছে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

১। দণ্ডিস্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ - শ্রীমদ শঙ্করাচার্য্যের আসন

২। ঈন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় - মলুটী রাজবংশ

৩। গোপালদাস মুখোপাধ্যায় ও অজয়কুমার সিন্‌হা - দেবভূমি মলুটী

৪। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় - মধ্যযুগে বাংলা

৫। গৌরীহর মিত্র - বীরভূমের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - বীরভূম বিবরণ (২য় খণ্ড)

৭। বরুণ রায় সম্পাদিত - বীরভূমি বীরভূম (প্রথম খণ্ড)

৮। রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস

৯। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ)

১০। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত - 'পশ্চিমবঙ্গ' (বীরভূম সংখ্যা)

১১। বিনয় ঘোষ - পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

১২। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে - সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস (নান্‌কারে সাঁওতালদের ইতিবৃত্ত)

১৩। শিবরতন মিত্র - প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

১৪। নিরঞ্জণস্বরূপ ব্রহ্মচারী - সুমেরু মঠস্য মঠাম্নায়ঃ

১৫। রিয়াজ-উস-সলাতীন (ইংরাজী অনুবাদ)

১৬। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য - বৌদ্ধদের দেব-দেবী

১৭. দেবকুমার চক্রবর্তী - বীরভূমের পুরাকীর্ত্তি

১৮। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাঁকুড়ার মন্দির

১৯। তারাপদ সাঁতরা - পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য, মন্দির ও মসজিদ

২০। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় - শিবলীলা

২১। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল	-	পুঁথি পরিচয় (চতুর্থ খণ্ড)
২২। অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	জয় জগদীশ হরে
২৩। কৃত্তিবাস ওঝা	-	রামায়ণ
২৪। দ্বিজ বংশীদাস	-	শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ
২৫। বৃন্দাবন দাস	-	চৈতন্য ভাগবত
২৬। কৃষ্ণদাস কবিরাজ	-	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৭। K. K. Dutta	-	The Santal Insurrection 1855-1857
২৮। W. W. Hunter	-	Annals of Rural Bengal
২৯। W. W. Hunter	-	Statistical Account of Bengal (Birbhum)
৩০। Elliots History of India, Vol II		
৩১। H. Blochman	-	Contribution to the Geography & History of Bengal
৩২। Coomarswamy A.K.	-	History of Indian & Indonesian Art
৩৩। Mc Cutchion David	-	Late Mediaeval Temples of Bengal
৩৪। G. Santra	-	Temples of Midnapur
৩৫। G. D. Mukherjee	-	Temples of Maluti
৩৬। Dr. Dinesh Chandra Sen	-	Inscription from Kabilaspur Temple

৩৭। West Bengal District Records, Birbhum 1786-1797 & 1855

৩৮। Santal Pargana Manual 1911

৩৯। Survey & Settlement operations in District Birbhum 1924-32

৪০। Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 44 - 1875

৪১। Report on the census of District Birbhum, 1891

৪২। Report of the Geological Survey, 1851-52

৪৩। Mc. Pherson Report - 1885

৪৪। D. D. Majumdar	-	W. B. District Gazetteers (Birbhum)
৪৫। P. C. Roychowdhury	-	Santal Pargana Gazetteers

৪৬। Gazette No. 1182 of 1-12-1983, Govt. of Bihar

৪৭। Newspaper	-	The servant
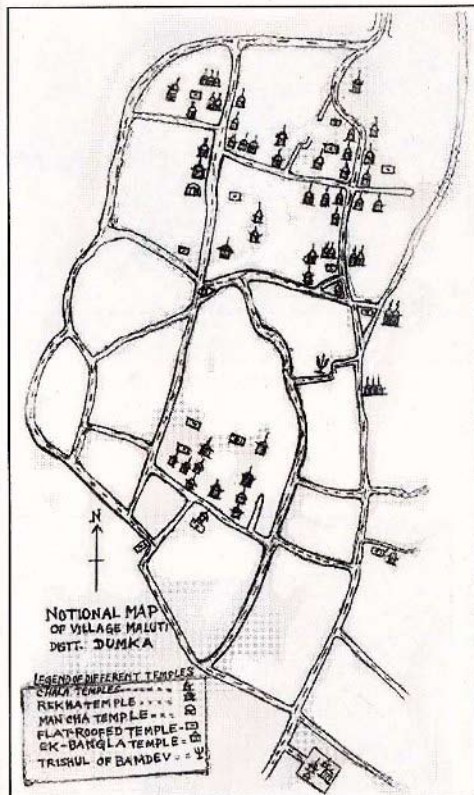
মলুটী গ্রামে বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থান

Plate I - চালা মন্দির
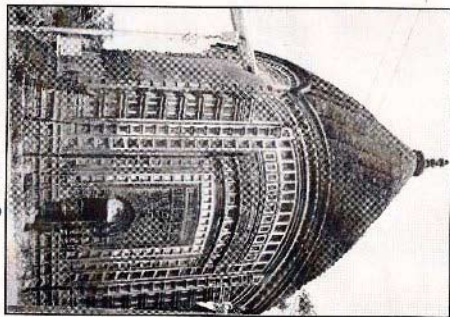
Plate II - রেখা মন্দির

Plate III - মঞ্চশৈলীতে নির্মিত রাসমঞ্চ মন্দির
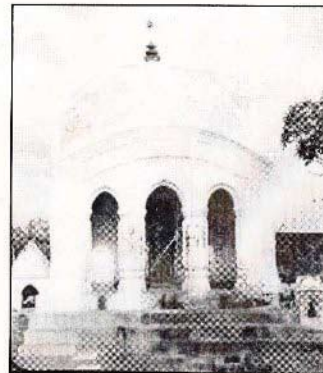
Plate IV - মৌলীক্ষা মায়ের এক-বাংলা মন্দির

Plate V - সমতল ছাদের দুর্গা মন্দির

Plate VI - মন্দিরের তিনটি চূড়া — মন্দির, গীর্জা ও মসজিদের প্রতীক

Plate VII - মুখ্য প্যানেলে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য

Plate VIII - মুখ্য প্যানেলে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার চিত্র
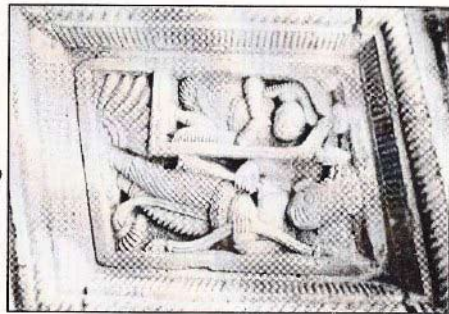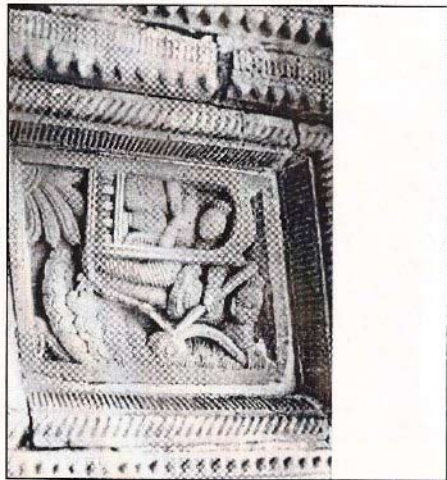
Plate IX - সীতাহরণ

Plate X - জটায়ু বধ

Plate XI - বস্ত্রহরণ

Plate XII - কংকের মতঙ্গজ মূর্তি
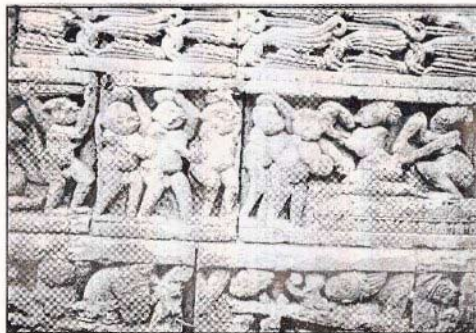
Plate XIII - সেতুবন্ধ
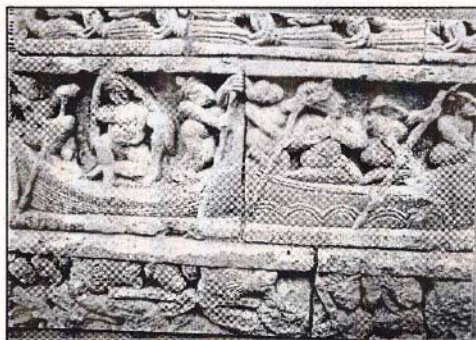
Plate XIV - নৌকাবিলাস

Plate XV - বাবু ডুলিতে যাচ্ছেন, নীচে কুকুর
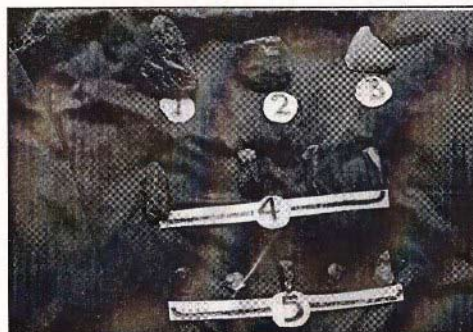
Plate XVI - চিলাকাঁদরে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের যন্ত্রপাতি
১ ও ২ - কুড়ুল, ৩ - চামড়া কাটার যন্ত্র (কাটার),
৪ - ঘষবার যন্ত্র (স্ক্র্যাপার), ৫ - মাংস টুকরো করার জন্য ব্লেড
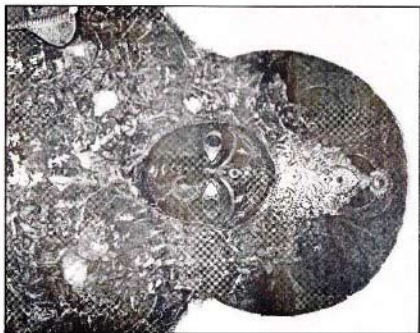
Plate XVII - মলুটীর মৌলীক্ষা মা

Plate XVIII - বামদেবের মন্দির। মন্দিরের সামনে অরবিন্দ স্মৃতিমণ্ডপ

Plate XIX - মলুটীতে বামদেবের ত্রিশূল ও শঙ্খ, পাশে মা কালীর শিলামূর্তি

Plate XX - পালযুগে নির্মিত ভাঙ্গা বিষ্ণু মূর্তি
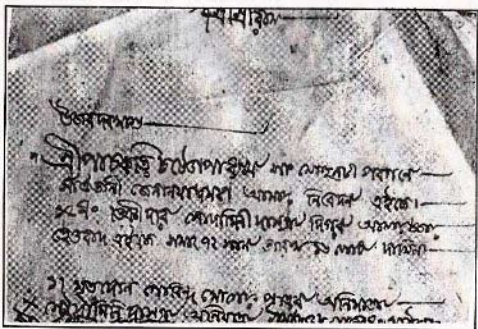
Exibit - 1 শ্রীমহেশচন্দ্র চৌধুরি পাওা ও শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত দলিলের অংশ

Abstract Khatian
Jamabandi No.
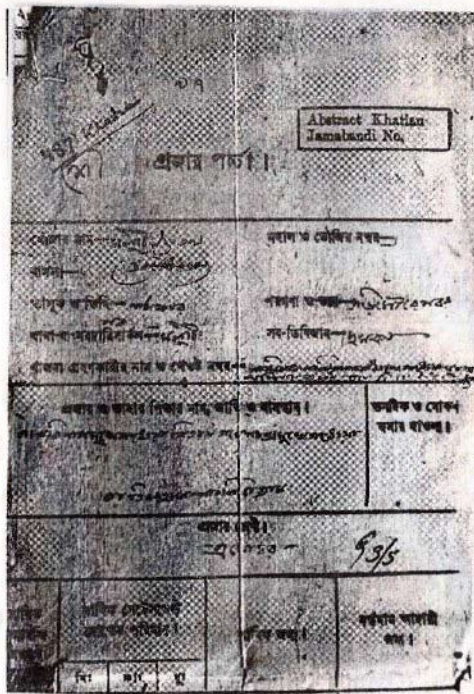
Exibit - 2 দড়ি মৌড়েশ্বর লেখা পুরাতন পর্চার প্রতিলিপি
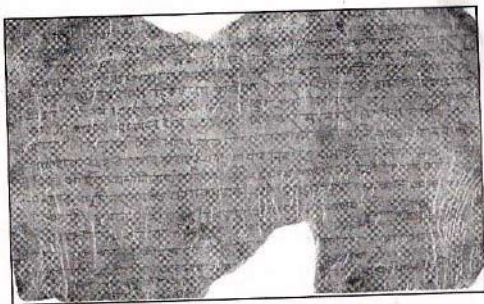
Exibit - 3 ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বক্রেশ্বর শর্মার পাঠানো চিঠির প্রতিলিপি

লেখক পরিচিতি

লেখক শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায় (১৯৩১) একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রথম জীবনে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে নিয়মিত সৈনিক রূপে ষোলো বৎসর সেবার পর ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। পরের বৎসরই তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। গোপালবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, এবং ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা ও আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ স্নাতক। ১৯৬০ হতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেগরী মুখার্জী ছদ্মনামে তাঁর লেখা নতশির ঊর্মি, গোপালপুরের উপকথা ও মোতিবাঈ নামে তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামে জন্মভূমি মলুটীর উপর গবেষণামূলক বই 'দেবভূমি মলুটী', ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে গল্পের আকারে মলুটীর উপর লেখা 'বাজের বদলে রাজ' এবং ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত, মলুটীর মন্দিরের উপর লেখা 'Temples of Maluti' প্রকাশিত হয়েছে।

মলুটীর উপরে লেখা উপরোক্ত পুস্তকগুলির আধারে এবং লেখকের দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ অনেক নূতন তথ্যের সংযোগে লেখা 'নান্কার মলুটী' একখানি তথ্যভিত্তিক পুস্তক। অনুসন্ধিৎসু লেখক এবং পাঠকের কাছে বইখানি আদরণীয় হবে বলেই আশা করছি।

— প্রকাশক